এ অন্তিম আশা।

কি কুক্ষণে সেইখানে তাহারে দেখিনু রে
চাঁদের কিরণে।
কি ঘুমে নয়ন মোর ঢুলিয়ে পড়িল রে
তার দরশনে॥
কত মনোহর বস্তু নিরখি ভুবনে রে,
ভাল নাহি লাগে।
সতত ঢুলিছে আঁখি সেই রূপ ধ্যানে রে,
প্রেম অনুরাগে॥
তার মন দিবে বলি আগে মোর নিল রে
ভুলাইয়া মোরে।
আজকাল আশা করি জনম কাটিল রে
না দিল আমারে॥
রমণী হইয়ে তারে সাধিতে হইল রে,
না পূরিল সাধ।
ভুলেও সে একবার ফিরে না চাহিল রে,
একি রে প্রমাদ॥
কোথা মোর ফুটে আছে জীবন কুসুম রে,
নয়ন রঞ্জন।
যাহার বিরাগবাণ বিঁধিছে মরমে রে,
নিঠুর সে জন॥
যাহার সৌরভে পূর্ণ হৃদয় কানন রে,
না জানি কারণ।
নিগন্ধ হৃদয়ে বহে মলয়পবন রে,
স্বভাব নূতন॥
যেই ঘুমে নিমিলিত আমার নয়ন রে,
তার কি তেমন।
যেই ধ্যানে বিমোহিত আমার পরাণ রে,
তাহারি কারণ॥

যার সমাধিতে আছে জীবন বিভোর রে,
কোথায় সে জন।
জ্বর জ্বর হ'ল মোর শরীর পতন রে,
নাহি দরশন॥
যে বীণা বাজায়ে আমি গাহিতেছি গান রে
বিষাদভুবনে।
কোন অভাগিনী যেন না গায় এ গান রে,
বিয়োগ পরাণে॥
যে কুসুমহার আমি পরেছি হৃদয়ে রে,
প্রেমের পুলকে।
কোন অভাগিনী যেন না পরে তাহায় রে,
আশার কৌতুকে॥
যে ভগ্নতরণী চড়ি হইতেছি পার রে,
বিষাদ সাগরে।
হেন দশা নাহি ঘটে কোন অবলার রে,
আশার আদরে॥
ছারখার হয়ে যাক্ বিরাগী হৃদয় রে,
বুঝিতে পারি না।
অবলাজনের প্রাণে আর কত সয় রে,
এ ঘোর যন্ত্রনা॥
যা আছে বিধাতা করু যাহা আছে মনে রে,
মরেছি মরমে।
সকলি সহিতে পারি একাতর প্রাণে রে,
অধিনী জীবনে॥
এ জনমে ঘুচিবে না প্রণয়পিপাসা রে,
অনন্ত নিরাশা।
জন্মান্তরে পাই যেন তার ভালবাসা রে,
এ অন্তিম আশা॥

শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় নবীন কবি ও কাব্য।

"বঙ্গীয় প্রাচীনকবি ও কাব্যের" উপসংহার কালে বলিয়াছিলাম, * যে বঙ্গের বর্ত্তমান কবিসম্প্রদায়ের ও কাব্য পুঞ্জের সমালোচন করিব। সেই সমালোচন এই প্রস্তাব হইতেই আরম্ভ হইবে। আমরা কবিরঞ্জনকে তাদৃশ বিশ্বজনীন কবি বলিয়া সমাহ্বান কবি নাই বলিয়া, সম্পাদক মহাশয়—'বঙ্গসাহিত্য' প্রণেতা দত্তজা মহাশয়ের মস্তকে একটা প্রকাণ্ড শিলা দিয়া "অথবিটির" খাস নমুনার মূর্ত্তি সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে একে বারে চক্‌ চকিয়ে দিয়াছিলেন—"Ram prasad was a true Poet, every inch of him" একথা বলাতে হয়ত, জগতের অনেক মোনন্‌ দাস, রামপ্রসাদের পুস্তক না পড়িয়াই কেবল দত্তজা মহাশয়ের ঐ লেখাতেই একটা অক্ষুন্ন মত সংগঠিত করিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা যত্ন সহকারে কাব্য পাঠ করেন ও অনুভূতিরূপ রসনা যাঁহাদের হৃদয় মধ্যে স্বতঃসিদ্ধরূপে বিরাজ করিতেছে তাঁহারা পরের মুখের দিকে চাহিয়া বড় একটা মতামত ব্যক্ত করেন না।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যুক্তি চায়,—অখণ্ডনীয় যুক্তি চায় বচন চাহে না। দত্তজা মহাশয় একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু খুব খ্যাতাপন্ন প্রতিষ্ঠিত লেখকেও সময়ে সময়ে অতি গভীর ভ্রমকূপে পতিত হইয়া থাকেন। বাইরন্‌ পোপকে কি কবির অগ্রণী বলিয়া সম্মতি দেন নাই? আবার সেই বাইরনই Wordsworth কে বলিতেছেন "A clumsy frowzy poem called the Excursion written in a manner that excites my aversion" রামপ্রসাদকে আমরা অপুষ্ট কবি ব[illegible] জগতে কেন তাহার যুক্তি পরে প্রকাশ [illegible] ক্ষীণ [illegible]

[illegible] সে সম্বন্ধী, ছন্দের লালিত্য ও [illegible]দির্ [illegible] কবিরাগ্রি[illegible] অভিধানের দান সাগ[illegible] চিরকাল বিশেষকে কবি বলিয়া খুব গেল্পিবোল করেন, খুব চীৎকার করেন, তাঁহার কথায় আমরা কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা করি না। Musical thought অর্থাৎ সঙ্গীতপূর্ণ চিন্তাই কবিতা—যে চিন্তা মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে, মনের আশে পাশে দেবর্ষির বৈণিক মাধুর্য্য ছড়াইয়া দেন, তুম্বুর মুনির আশ্চর্য্য কণ্ঠধ্বনির অনুস্বর ব্যক্ত করিয়া প্রাণকে অন্তরের দিকে লইয়া যায়, সেই চিন্তাময়ী কবিতাকেই আমরা কাব্য বলি, সেই কাব্যের স্রষ্টাকেই আমরা সারসিক কবি বলিয়া পূজা করিয়া থাকি।

সাধারণতঃ আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, কবি আমাদিগকে তাহা হইতে আরও কিছু অধিক দেখাইয়া দেন। একটা

* ১৯ [illegible] পৃষ্ঠা দেখ।

বিরহের কথা লিখিতে হইবে, অমনি সেই লেখার মধ্যে আকাশ হইতে চাঁদ বেচারীকে পাড়িয়া, তাহাকে দুটা তিরস্কার করত "হায় হায়" "কে থা গেলে" প্রভৃতি গোটা কতক বাঁধিগৎ চালাইয়া এক কবিতা রচনা করিলাম, নাকিস্বরে পড়িতে আপাততঃ বড় মধুর লাগিল কিন্তু তাহাতে হৃদয় বিভেদকারিণী চিন্তার নাম গন্ধও থাকিল না—ভাবের স্রোতঃ একবারও বহিল না, যেমন চলিল অমনি পঙ্কস্থ পাইল।

এইরূপ কবিতার মালা পরিয়া বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজ না জানি কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহা একটা বড় হাসির কথা, বড় [illegible] কতকগুলা বালিস মাত [illegible] র ঠাট বসাইয়া এই হতভাগা দে[illegible] গণের মধ্যে অনেকেই বৎসর [illegible] বিতে একেবারেই কবিবর হইয়া [illegible]

আমি যাহা বাস্তবি[illegible] নই [illegible]লোকের নিকটে সেইরূপ হইবার ভাণ করিতে যে কেন লজ্জাবোধ করি না বলিতে পারি না। যে দাড়কাক ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া নৃত্য করে ও কেকারবের অনুকরণ করিতে চায় তাহার সেই ছদ্মকাবিতা জনসমাজে অভিব্যক্ত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

খুব যাঁকাল যাঁকাল বিজ্ঞাপনের বলে—সহায় সম্পত্তির বলে ও মিত্রীকৃত সাময়িক পত্রিকার অনুকূল সমালোচনায় একজন সাধারণ লেখকও কিছু দিনের জন্য প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু মেকি টাকা যে একদিন মূল্যহীন বলিয়া আবর্জ্জনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তাহাতে আর একটুও সন্দেহ হইতে পারে না। একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এমন সময় একদিন অবশ্যই আসিবে যে, ঐ সকল আধুনিক মিথ্যা প্রশংসিত লেখকের দল পরমাণুর ন্যায় অনন্ত আকাশের মধ্যে কোথায় মিশিয়া যাইবে। সমদর্শী সমালোচকগণ ভবিষ্যতে এই সকল লেখকগণকে বক্ষ হইতে উঠাইয়া সমালোচনের হাড়কাষ্ঠে ফেলিয়া, তীক্ষ্ণ লেখনীরূপ আয়ুধ ঘাতে বলিদান করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

কোন লেখকের বর্ত্তমান প্রশংসাবাদ কোন কাযেরই নহে, ভবিষ্য পুরুষেরা যে লেখকের আদর করেন ও দেবতা বলিয়া পূজা করেন তিনিই যথার্থ লেখক। কবিতার মধ্যে সুচিন্তা থাকিবে না, ভাবের চমৎকারিতা থাকিবে না অথচ উহা কাব্য বলিয়া পরিচিত হইবে একথা কে বিশ্বাস করিবে? কেবল ছন্দের গুম্ফন কৌশল, কি যমকের কারুক্রিয়া থাকিলেই যদি কবিতা হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে ঝুড়ি ঝুড়ি সেক্সপিয়র ও কালিকাসের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত।

ডার্ম্মডি জীবিতাবস্থায় শতসহস্র লোকের প্রশংসা পাত্র হইয়াছিলেন। সাউদির প্রিয়বন্ধু জোন্‌স্ কোয়াটারলি রিভিউএর অনুকূল সমালোচনে ও বন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় তাৎকালিক কত শত ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কয়জন লোক তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে?

Annaseward কেশবিন্যাস করিতে করিতে হোরেসের গীতিকা ভাষান্তরিত করিতেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কয়জন সুহৃদয় প্রমাতা সেই গীতিকা পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন? একজন সমালো-

ভিজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তি অন্যের রচনা ক্ষিপ্র কাবিতা ও শব্দছটার ঘটা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সারগ্রাহী প্রমাতা সেরূপ স্তূপাকার লেখা দর্শনেও আশ্চর্য্য হন না, বরং ঐ রূপ রচনা মধ্যে চিন্তা শীলতার অভাব দর্শনে মনে মনে ঘৃণার নরক সৃষ্টি করিয়া, তাহার মধ্যে যথেচ্ছ লেখককে চিরকালের মত নিক্ষেপ করিয়া রাখেন।

সরস কবিতার সহিত সহৃদয় প্রমাতার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানাইবার নিমিত্ত কালিদাসাদি প্রাচীন কবিসময় হইতে যে প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিতেছে সুবিজ্ঞ পাঠক তাহার মর্ম্ম একবার অনুভব করিয়া দেখুন :—

"প্রাজ্ঞেষু সৎকবি বচো লভতে বিকাশং
ছাত্রেষু কুট্মল সমং তৃণবচ্চজেষু।
স্বাত্যম্বু শুক্তিকুহরে পতনীবমুক্তা
মুক্তেব পঙ্কজদলে ন রজঃসুকিঞ্চিৎ॥

অর্থাৎ স্বাতি নক্ষত্রের জল শুক্তিকুহরে পড়িলে যে রূপ মুক্তা হয়, পদ্মপত্রে পড়িলে মুক্তাসদৃশ অবয়ব ধারণ করে এবং ধূলায় পড়িলে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়, সৎ কবির রসাল বাক্যও ঠিক সেইরূপে সহৃদ য়ের নিকটে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যাহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চ্চা করে অথচ সহৃদয় প্রমাতা নহে তাহাদের নিকটে পুষ্প কলিকার ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা মূর্খ তাহাদের কাছে উহা তৃণের ন্যায় অসার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বাবু রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, ঈশান চন্দ্র, প্রিয়নাথ, কামিনী, প্রণেতা গিরীশ চন্দ্র, ভুবনমোহিনী, অক্ষয়, নবীনচন্দ্র, ও নগেন্দ্রনাথের কাব্য সমালোচন করিব। ইহার মধ্যে সময়ে সময়ে প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমবাবুর কথাও বলিতে হইবে। আমরা এখানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম করিলাম না কেন ইহা ভাবিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন, কিন্তু একটু বিবে চনা করিলেই সে ভ্রমদূর হইতে পারিবে।

মধুসূদনের কবিতা তরঙ্গিণীতে এখনও বর্ষার শোভা আছে, উর্ম্মিমালার চাঞ্চল্য আছে—আবেগ আছে—উচ্ছ্বাস আছে এবং উহার স্রোতের মধ্যে রৌরব, তাণ্ডব, ও লাস্য এই ত্রিবিধ নর্ত্তনের আভাসও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিছুদিন পরে ভবিষ্য জগতের কাছে এ সকল থাকিবে না অথচ ক্ষীণ সত্ত্বর ন্যায় প্রবাহিত হইবে বুঝিয়া, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। সঙ্কল্প করিয়াছি। বঙ্গীয় কাব্যজগতে মাইকেল চিরকালই বাঁচিবেন কিন্তু যৌবন জীবিত থাকিবেন কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের কথা :—"কবিমাত্রেই হৃদ য়ের মধ্যে জগতের সৌন্দর্য্য সঞ্চয়পূর্ব্বক, কবিতার এক একটী ভাবময়ী নূতন মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন—বৈদ্যুতীয় পদার্থের ন্যায় এই মূর্ত্তির অবয়ব আছে, কিন্তু উপাদান নাই, এই মূর্ত্তির নিকটেই কবি আপনার হৃদয়নিহিত সুখদুঃখের কথা জ্ঞাপন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে একটি নক্ষত্রের করুণবিলাপ আকাশ শুনিল না দেখিয়া—জগৎ বুঝিল না দেখিয়া, কবি হৃদয়বর্ত্তিনী সেই প্রতিমূর্ত্তির নিকটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনিয়া বিনিয়া বলিতে লাগিলেন,— ~~কর~~

সেই
ভুবি

অমনি ছুটিল—সহস্র বাধা মানিল না, ঝঞ্ঝাবাত মানিল না—যে দিকে সেই বীণাধ্বনি সেই দিকেই ছুটিল।

একবির মনোমন্দিরস্থিত এই আশ্চর্য্য-ভাবময়ী মূর্ত্তিখানি আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিবার সময়ে দেখিতে পাই, ঐ দেখ কারলাইল বলিতেছেন:—"We are all poets when we read a poem" বাজে কবির দল, জগতে আত্মগৌরব স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রকৃত কবির প্রাণের চিত্র চুরি করিয়া, সেই মূর্ত্তি যেন তাহাদেরই হৃদয়সম্ভূত বলিয়া, সাধারণের নয়নকে বিমোহিত করিতে চেষ্টা করে, ইহারা যে মনের মধ্যে কত প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন করে তাহার ইয়ত্তা নাই। মনে অনেক প্রতিমা থাকে কিন্তু আপনার বলিয়া কাহারও উপর তেমন স্নেহ জন্মে না, মমতা জন্মে না ও আকাশব্যাপী ভালবাসাও জন্মে না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূর্ত্তি বড় মনোহারিণী, উহাতে ছায়ালোকের বিন্যাস দেখিয়া, একেবারে স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। স্বপ্নদেবের যদি কোন ভাষা থাকে তাহলে সেই ভাষায়,—রাগ রাগিণীর যদি গাইবার কোন শক্তি থাকে তাহলে সেই গাথায় ও নূতন বিকসিত নলিনী সৌরভস্রক্ষিত সেই আশ্চর্য্য শোভায় এ চিত্র বিনির্ম্মিত।

এই কবিতাসুন্দরীর সহিত আলাপ করিতে. করিতে বোধ হয় যেন এ জগৎ ছাড়িয়া অন্য কোন জগতের আনন্দময় ধামের মধ্যবর্ত্তিপথ দিয়া যাইতেছি, কোন অশ্রুতপূর্ব্ব বংশীধ্বনি শুনিতেছি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, মল্লিকার নিশ্বাসের ন্যায়; বর্ষাসম্ভূত নবীন নীরদের ন্যায় ধী[illegible] মন্থর,—যখন ইহা ধীরে ধীরে চলিয়া যায়—মন্থরভাবে গাইতে গাইতে চলিয়া যায়, তখন ইহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনির অস্ফুস্বর নিরন্তরই কর্ণের মধ্যে ঘুরিতে থাকে। "It seemed like the ceasing of exquisite music" মেঘশূন্য অমানিশির নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় রবীন্দ্রের প্রতি কবিতার প্রতি ছত্রের মধ্য হইতে কেমন একটি নির্ম্মল আলোক বাহির হইয়া চিত্তকে মোহিত করে। ভাবের এমত রাগ রঙ্গিনী, এমন রাগিনী অনেক প্রসিদ্ধ কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল অপূর্ব্ব কথার উল্লেখ করিলাম বলিয়া কি রবীন্দ্রনাথের দোষ নাই? অনেক দোষও আছে, সে কথারও উল্লেখ করিতেছি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতির বিশ্বাস ছিল যে একটু যত্ন বা চিন্তা দিলেই তাহাদিগের হৃদয়ে বীণাপাণির আবির্ভাব হইত, আমাদের অভিনব কবি রবীন্দ্রনাথকেও সেই মতাবলম্বী বলিয়া অনুভব হয়। এই কারণেই তাঁহার কোন কোন কবিতার মধ্যে জোরের সহিত ভাবের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিন সন্ধ্যাকালে কি দেখিয়া যেন একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল—ভাবটাকে অতি সুন্দর বলিয়া মনেও হইয়াছিল, তার পর কোন একটা চিন্তার তাড়নায় মনের মধ্যে কোথায় যেন সেই ভাবটা লুকাইয়া গেল তাহার ঠিকানা রহিল না—কোন বহুমূল্য বস্তু হারাইলাম বলিয়া ক্ষোভ জন্মিল না, পরে আর একদিন শত শত কাজের মধ্যে হইতে সেই ভাবটা অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া আবার মনের এক কোণ হইতে অল্পমাত্র উঁকি দিল ও অতি স্বচ্ছ

স্বরে বলিল "আমাকে যত্ন করিবে বলি যাছিলে, কৈ তারপর ত, আমার প্রতি আর ফিরে চাহিলে না, আমার বিষয় একবারও ত ভাবিলে না?" ভাবের এই কথা যেই কর্ণে প্রবেশ করিল অমনি আমাদের অভিনব কবি সেই ভাবটাকে লইয়া একটা কবিতা করিয়া বসিলেন, কিন্তু অবগুণ্ঠনে আবৃত বলিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। রবীন্দ্র নাথের কাব্যের মধ্যে মধ্যে এরূপ ধরণের কবিতাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেরূপ ক্ষুদ ক্ষুদ্র শত দোষ সত্বেও তাঁহার কবিতার রসমাধুর্য্যে ও ওজোগুণে সে সকল দোষ দেখিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। রবীন্দ্র নাথের কবিতার দোষ ও তিলোত্তমার ললাটে তিলচিহ্ন এ দুইই সমান —"একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

তাঁহার "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কাব্য জগতের মধ্যে অকীটানুবিদ্ধ এক অত্যুজ্জ্বল মহারত্ন—যেমন আবেগ, তেমনি বিশ্রাম, এখানে প্রাণের হাহাকার অনন্ত পূর্ণশান্তির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
যাইব বহিয়া যাইব বহিয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।
যত দেব' প্রাণ ব'হে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর।
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

এই কাব্যটি হৃদয়ের মধ্যে ভূমিকম্পোৎপাদনকারিণী কেমন এক অত্যাশ্চর্য্য অতিভূমি গামিনী জ্বলন্তভাষা; শুদ্ধ ও অকৈতব প্রেমের জন্য মনঃ উন্মত্ত না হইলে কে শুদ্ধ প্রেমিক হইতে অগ্রসর হইতে পারে? এপ্রেমে রূপ নাই, মদন নাই ও রতি নাই, ইহাতে কেবল অনুরাগ—সনাতন ধামের ভোগ্য বস্তু—এক মাত্র ভোগ্য বস্তু সেই অনুরাগঃ—

"ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে
ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন"।

এইখানেই কল্পনার পারিজাত ফুটি ফুটি ভাব ধারণ করিয়াছে। মহাসিন্ধু মহাধ্যানে নিমগ্ন তবুও ভারত হৃদয় ভেদ করিয়া প্রেমের পাঞ্চজন্য আপনিই যেন বাজিতেছে। সেই রব শুনিতে কেহ নাই বুঝিতে কেহ নাই—আকাশ শুনিতেছে, প্রতিধ্বনি বুঝায়ে দিতেছে তবু যেন বুঝিতেছে না। এই স্থলে নির্ঝরের বাসনা হইতেছে—

"একাকী চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই"

এই স্থলেই কল্পনার ফুল অর্দ্ধফুটন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে—ইহার পরই সাগরের সহিত নির্ঝরের মিলন হইল, কবি সে মিলনের উল্লেখ না করিয়া আরো কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে অশান্তির উপর মহাশান্তি স্থাপন করিয়া আবার কেন তাহার অব্যবহিত পরেই "অভিমানিনী নির্ঝরিণীর" কথা পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইল? অক্ষয় বাবুর অভিমানিনী নির্ঝরিণীর মধ্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য থাকিলেও উহা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পিট পিট দেওয়া উচিত হয় নাই। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর দুখানি নির্লিখিত শাদা

পৃষ্ঠা সংযোজন করিলে তবে যথার্থ ভাবুকের কাজ করা হইত। এরূপ মহাশান্তির পর রবি কেন খানিক নিঃশব্দ থাকিলেন না।

প্রকৃতির আলয়ে সত্যের তুলিকায় মনুষ্যহৃদয় চিত্রকরাই কবির ধর্ম্ম। "All the greatness of the man comes out decisively here" জগতের উপর মহত্ত্বের মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া, কবি আত্মকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন—চন্দ্র হোক্ সূর্য্য হোক্, পুষ্প হোক্ যাহা কিছু দেখেন তাহাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষকের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। জগৎকে স্বার্থ হইতে পাপ হইতে অন্তর করিয়া স্বর্গের শোভা তাহার হৃদয়ে স্থাপন করেন :--

"A cheerful life is what the Muses love
A soaring spirit in their prime delight"

(যতগুলি গীতিকাব্য এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তার মধ্যে প্রভাত সঙ্গীতই সকল গুলির শীর্ষ স্থানীয়।)

যিনি কবিতা রসমাধুর্য্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, সুচিন্তার ঊষালোকে ভাসিতে ভাসিতে গিয়াছেন তিনিই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সৌন্দর্য্য অনুভবে সক্ষম হইয়াছেন। (রবীন্দ্র নাথের বিরহ বর্ণন সাধারণ লোকে বুঝিবে না, উহা সহৃদয়সংবেদ্য ও বেদ্যান্তরস্পর্শ শূন্য। তাঁহার বিরহ বর্ত্তমান ও অতীত ছাড়া। যাঁহার নিমিত্ত তিনি কাঁদেন—উৎকণ্ঠানদীর সেতু ভাঙ্গিয়া দেন সে বস্তু যেন জগতে জন্মে নাই। কবির এই জগতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিত্য আত্মার সহিত যেন কাহারো ভালবাসা জন্মিয়াছিল; জন্মিবার পূর্ব্বে যার সঙ্গে মনে মনে মিলন হইয়াছিল, সে নিধি যেন অন্য কোন জগতে গিয়া পড়িয়াছে, তাই তার নিমিত্ত রোদন।) যাহারা অমানুষ ও হৃদয় শূন্য তাহাদের দুঃখ ও বিরহ যন্ত্রণা সঙ্কীর্ণ এবং লৌকিক, তাহারা একটি শিশুর চোষণ কাটির জন্য দুঃখরবে আবার সেই চোষণ কাটি পাইলেই তাহাদের দুঃখ সন্তাপ সব বিদূরিত হয়। হৃদয়বান্ রসজ্ঞের দুঃখ অগাধ সমুদ্রবৎ, তাঁহার বিলাপও মেঘমন্দ্রবৎ অতি গম্ভীর ও দুরবগাহ; দুঃখ সাগর মন্থন করিয়া যতক্ষণ তিনি সুধা সঞ্চার করিতে না পারেন, ততক্ষণ আর নিস্তার নাই, কোনরূপ প্রলোভনে তিনি ভুলিয়া যান না। যে দুঃখ হৃদয়ের মধ্যে অসীমভাব ধারণ করিয়া দাড়াইয়া আছে তাহারই মূলনির্দ্ধারণের নিমিত্ত তিনি ছুটিতে থাকেন, ছুটিতে ছুটিতে তিনি পূর্ব্বজন্মের অন্য কোন জগতে গিয়া উপস্থিত হন, সেখানে গিয়া, তাঁর সেই হারান বস্তুকে কাতর কণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, সেই জগতের লোক তাহার ভাষা বুঝিতে না পারুক মন বুঝিয়া তাঁহার দুঃখকে হ্রাস করিবার চেষ্টা করে।

যদি আফ্রিকাবাসী কোন ব্যক্তি বঙ্গের কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া কোন অপূর্ব্ব পদার্থের জন্য রোদন করে, তাহা হইলে তাহার ভাষা বুঝিতে না পারিলেও আমরা অনায়াসেই তাহার হৃদয় বুঝিতে পারি। কিন্তু কবির সম্বন্ধে তাহা নহে, কারণ অন্য কোন অপরিজ্ঞাত জগতের কোন পদার্থ বিশেষের নিমিত্ত কবি যখন কাঁদেন, তখন তাঁহার ভাষা বুঝিয়াও তাঁহার বিলাপ বুঝিয়াও তবু যেন আরো কতকটা কি বুঝিতে পারি না; যথা—

"অয়ি প্রতিধ্বি !
বুঝি আমি তোবে ভাল বাসি
বুঝি আব কারেও বাসি না
আমাবে কবিলি তুই আকুল ব্যাকুল
তোব লাগি কাঁদে মোব বীণা
* * * * *
তোবে আমি দেখিনি কখনো
তবু বে অতুল রূপবাশি
তোব আধ কণ্ঠস্বব সম
প্রাণে আধ বেডাইছে ভাসি
তাবে দেখিবাবে চাই, তাবে ধবিবাবে ধাই
সেই মোবে কবেছে পাগল
তাবি তবে চবাচব সুখ শান্তি নাই
তাবি তবে পবাণ বিবত॥"

যাহাকে কখন দেখি নাই —উঃ কি উচ্চ দবেব রূপ কল্পনা—এই ত ফল্গুব ন্যায় অন্তঃশিলারূপে আত্মসমর্পণ। সেলিও এইরূপে কাঁদিযাছেন এইরূপে কাঁদিতেন, কাব জন্য ? ইহা সহৃদয সংবেদ্য, যথা—

"I loved—oh no· I mean not one of ye
Or any earthly one, though ye are dear
As human heart to human heart may be
I loved I know not what But this low sphere
And all that it contains, contains not thee,
Thou, whom seen nowhere, I feel every where"

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।

ভারত ইতিহাসের একটি ঘটনা।

(ষ্টেটসম্যান পত্রিকা হইতে গৃহীত)

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে, ভারতলক্ষ্মী ভবিষ্যতে কাহার অঙ্কনিপতিতা হইবেন এই কথার মিমাংশা কবিবার জন্য ইংবাজ এবং ফরাসী উভয়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত। সংগ্রাম অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতেছে, জগদ্বিখ্যাত ফরাসী সেনাধ্যক্ষ বুসি তখন সসৈন্যে উত্তর সরকারে অবস্থিতি করিতেছেন, আর কর্ণাট উপকূলস্থ যত রাজা রাজরাড়া হয় তাঁহার কিম্বা ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরস্পরের ব্যক্তিগত ক্রোধ নির্ব্বাপিত কবিতে গিয়া স্বদেশের—মাতৃভূমীর সর্ব্বনাশেব পথ পরিষ্কৃত কবিয়া দিতেছেন।

যুদ্ধ করিতে করিতে বুসি যখন রাজামন্ত্রী নগরে উপস্থিত হয়েন, বর্ত্তমান বিজয়নগব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিজয়রঙ্গ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ কবেন এবং ববিলীর রাজা এবং তাঁহার পরম শত্রু রঙ্গরাওকে নিধন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ববিলীর

রাজবংশ কর্ণাটের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন এবং প্রতিষ্ঠাশালী বংশ ছিল, কথিত আছে, অতি পুরাকালে—যে সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের নাম পর্যন্ত শ্রুত হয় নাই—উড়ীষ্যা প্রদেশ হইতে একজন অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা আসিয়া সমস্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ জয় করেন এবং তৎপরে তাহা আপন সেনানীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। বর্ত্তমান পলিগারেরা সেই সেনানীদিগের বংশসম্ভূত। এই পলিগারেরা আপনাদিগের বংশ মর্য্যাদার বড় গৌরব করিয়া থাকেন, এবং ক্রিয়া কলাপ আচার ব্যবহারে অসাধারণ কঠোরতার সহিত হিন্দুধর্ম্মানুমত সকল প্রকার নিয়ম রক্ষা করেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময়ে সতীদাহ তাঁহাদিগের মধ্যে একটি সাধারণ প্রথাস্বরূপ প্রচলিত ছিল। রঙ্গরাও ইঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি এবং পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। বিজয়রঙ্গের সহিত তাঁহার পরম শত্রুতা ছিল, সর্ব্বদা উভয়ে কলহ বিবাদ হইত, কিন্তু তাঁহার ভয়ে বিজয়রঙ্গকে সততই সশঙ্কিত থাকিতে হইত।

বিজয়রঙ্গ শত্রুনিপাতের অভিপ্রায়ে বুসির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইলেন যে রঙ্গরাও যেরূপ দুষ্টলোক তাহাতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে তাঁহার দেশজয় কার্য্যে অনেক ব্যাঘাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া বুসি অচিরাৎ রঙ্গরাওকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে অন্যত্র তাঁহাকে একটি রাজত্ব দেওয়া যাইতেছে, তিনি আপন রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া তথায় প্রস্থান করুন। রঙ্গরাও অতিশয় ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন, এবং বুসি এরূপ প্রস্তাব করিতে সাহস করিয়াছেন বলিয়া ক্রোধে, তাঁহার একদল সৈন্য যে সময়ে ববিলীর সীমান্তবর্ত্তী স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, তাহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য যে রঙ্গরাওর এই ঔদ্ধত্য এবং অবৈধ আচরণে বুসির ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অচিরে তাহার অহঙ্কার চূর্ণ এবং নিধন সাধন করিবেন।

অসাধারণ রণবিক্রমশালী ফরাসী সেনাধ্যক্ষ বুসির পক্ষে রঙ্গরাওর ন্যায় একজন ক্ষুদ্র রাজাকে নিধন করা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে, আর বাস্তবিকও অচিরে তাহাই ঘটিল। কিন্তু কি করিয়া তাহা ঘটিল, তাহা কি প্রকার লোমহর্ষণ ব্যাপার, এবং তাহাতে ভারতবাসীদিগের অসাধারণ বীর্য্যবত্তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এবং স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মের উপর মমতা কিরূপ বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে বিভাসিত পাঠকবর্গ তাহা শ্রবণ করুন।

বুসি সসৈন্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া রঙ্গরাও আপন রাজ্যাভ্যন্তরস্থ একটি সামান্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই দুর্গটি চতুষ্কোণ এবং অতিশয় ক্ষুদ্র; চারিদিকে ৪০০ শত হস্তমাত্র লম্বা এবং ১৪ হস্ত পরিমিত উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার চারি কোণে চারিটি মুর্চ্চা ছিল, এবং প্রত্যেক প্রাচীরের মধ্যস্থানে বহির্দ্দেশে এক একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ স্থান প্রসারিত ছিল। যে স্থানে ইহা অবস্থিত ছিল তাহা খানিক দূর বেস পরিষ্কার ছিল; কিন্তু তাহার পর চতুর্দ্দিকেই অতিশয় প্রশস্ত নিবীড় জঙ্গলে আবৃত ছিল।

এই সামান্য দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য বুসি ৭৫০ জন ইউরোপীয় সেনা, ৪টি তোপ এবং ১১ হাজার সিপাহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। এই সিপাহী সেনা বিজয়রামের ছিল, এবং তিনিই স্বয়ং উহার সেনাপতিত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে সেনা লইয়া আসিয়া যখন দুর্গের সম্মুখে হইল, তখন তাহারা সমস্ত সেনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে এক একটি তোপ সঙ্গে দিয়া চারিদিক হইতে চারিটি মর্চ্চা একেবারে আক্রমণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। দুর্গের অভ্যন্তরে স্বয়ং রঙ্গরাও ছিলেন এবং তাঁহার স্বজাতীয় এবং অনুগত ২৫০ জন মাত্র পরিবারের সৈন্য এবং তাহাদের পরিবারস্থ প্রায় ৬০০ শত স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা ছিল। সকলেও প্রাণসঙ্কল্প করিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, হয় মরিব, না হয় জয়ী হইব ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল।

২৪ জানুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইতে হইতেই শত্রুর আক্রমণ আরম্ভ হইল। চারিটি ভীষণ তোপ চারিটি মুর্চ্চার উপর অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। মুর্চ্চা মৃন্ময় এবং চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও মৃন্ময়, তাহারা কতক্ষণ গোলার বেগ সম্বরণ করিতে পারিবে? দেখিতে দেখিতে বেলা ৯টার মধ্যে অনেক স্থানে ভগ্ন এবং ছিদ্রিত হইয়া গেল। এমন সময়ে সমগ্র শত্রুসেনা একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে অগ্রসর হইয়া দুর্গ প্রবেশের উপক্রম করিল; কিন্তু রঙ্গরাওর অনুগতেরা এরূপ ক্ষীপ্রতার সহিত সকল দিক রক্ষা করিতে লাগিল যে এক ঘণ্টাকাল চেষ্টা করিয়াও তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। কতক কাল বিশ্রাম করিয়া আবার তাহারা অগ্রসর হইল, ক্রমাগত গোলাঘাতে প্রাচীর এতক্ষণে ভগ্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যাও এত বেশী ছিল যে তাহাদের গতিরোধ করা যাইবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এবারেও সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল। বিশেষ যদি এবং বালানির সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিবারদিগের সাহস বেশী দেখিয়া বিজয়ী হইতে লাগিল, তাহারা প্রবলভাবে বন্যাধারার ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। যদিও ভগ্ন প্রাচীরের উপর শত শত মৃত দণ্ডায়মান, যেদিকে দেখিতে শত্রুর গোলার আঘাতে এক একটি বৃক্ষবৎ ভূমে পতিত হইতেছে, তথাপি প্রাণ থাকিতে কেহ পশ্চাৎপদ হইতেছে না। তাহাদের সাহস ও অমানুষিক বিক্রম দেখিয়া শত্রুপক্ষীয় ইউরোপীয়েরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল, মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং অনেক বার অভয় প্রদান করিয়া যুদ্ধে বিরাম দিবার প্রস্তাবনা করিল, কিন্তু তাহারা সে প্রস্তাবনা বারম্বার অগ্রাহ্য করিল,—বলিয়া পাঠাইল যে মৃত্যু শ্রেয় তথাপি শত্রু হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিবে না। এইরূপে প্রায় তৃতীয় প্রহর দিন অতীত হইয়া গেল, তখন পর্য্যন্ত বুসি এবং বিজয়-রাম দুর্গাভ্যন্তরে পদার্পণ করিতে পারিলেন না। তখন একবার যুদ্ধ থামিল। এই অবসরে রঙ্গরাও আপন অধীনস্থ প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তিকে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন যে "দেখ, শত্রুর লোক বল যেরূপ তাহাতে আমরা যে আর বেশিক্ষণ দুর্গ-রক্ষা করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এমন অবস্থায় আমাদের মরণান্তে স্ত্রী কন্যারা

যাহাতে শত্রু হস্তে নিপতিতা না হয়, তাহাদের সতীত্ব এবং সম্মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।" রঙ্গরাওর অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবামাত্রই জন কতক লোক সেই উপায় বিধান করিতে প্রস্তুত হইল। সে উপায় কি? সে ভয়ানক উপায়, তাহা শুনিলে বাস্তবিকই লোমহর্ষণ হইয়া থাকে। তাহারা অবিলম্বে সমগ্র দুর্গের মধ্যস্থানে যে গৃহমধ্যে স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকারা ছিল তথায় অগ্রসর হইল, এবং জ্বালিতমসাল দ্বারা তাহার চালে অগ্নি প্রদান করিয়া দিল। দশদিক হইতে দশজন অগ্নি প্রদান করাতে তৃণাচ্ছাদিত চাল দেখিতে দেখিতে একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভিতরে যাহারা ছিল তাহারা প্রাণের ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং যে যে দিক দিয়া পারে বাহিরে নিষ্ক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই সশস্ত্র যমোপম সৈনিক পুরুষেরা দণ্ডায়মান; যে বাহির হইতে চায় তাহাকেই তদ্দণ্ডে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। কতক এইরূপে হত হইল, আর অবশিষ্ট সকলে দেখিতে দেখিতে গৃহাভ্যন্তরে জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। যখন এই ব্যাপার শেষ হইয়া গেল, পঞ্চশতাধিক স্ত্রীপুত্র আপনাপন স্বামী এবং পিতার হস্তে প্রাণ হারাইয়া যখন নিস্পন্দভাবে মৃত্যুশয্যায় শায়ীত হইল, তখন রঙ্গরাও এবং তাঁহার অনুগত পল্লীগাবের পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ সাহস এবং একপ্রাণতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল; তাঁহাদের আত্মরক্ষার প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র হ্রাস হইল না; কিন্তু কতক্ষণ অসংখ্য শত্রুসেনার সঙ্গে তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন? দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের নিজের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, এবং এমন সময়ে রঙ্গরাও নিজে একস্থানে একটি গোলার আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পতীত হইবামাত্র যে দিকে যে ছিল সকলেই তাঁহার দেহ রক্ষা করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, দুর্গের অপর সমস্ত দিক শূন্য হইয়া গেল, আর সেই অবসরে শত্রুসেনা পালে পালে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ফেলিল।

বুসির দুর্গ জয় হইল; কিন্তু দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি এবং তাঁহার সৈনিকেরা যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল এবং নিজ অকর্ম্মের দারুণ শোচনীয় ফল চিন্তা করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। যে দিকে তাকান সেই দিকেই মৃতদেহ— অগণ্য বালকবালিকা এবং স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিহীন অথবা ভস্মীকৃত মৃতদেহ।

সকলে হতবুদ্ধি হইয়া এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন; শত্রুপক্ষীয় সকলেই মৃত, জীবিতের নাম গন্ধও নাই এইরূপ চিন্তা করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন এমন সময় দেখা গেল যে হটাৎ দুর্গের একটি কোণ হইতে একজন বৃদ্ধ একটি বালকের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া বালকটিকে সেনাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিল "এই লউন, এটি রঙ্গরাওর একমাত্র পুত্র, ইহাকে ইহার পিতার অসম্মতিক্রমে জোর করিয়া আমি রক্ষা করিয়াছি।" ভয়ানক দুঃখের অবসানে কোন সুখের

প্রাপ্তি হইলে যেমন লোকে আহ্লাদিত হয় বিজয়বঙ্গের এই পুত্রটি পাইয়া সকলে সেই রূপ আহ্লাদিত হইলেন। বুসি বড়ই সুখী হইলেন, ভাবিলেন একটি সমগ্র বংশ এবং জাতিকে নিধন করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন, এই পুত্রটীকে রক্ষা এবং লালন পালন করিলেও যদি তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্খালিত হয়।

দুঃখের কথা, বিশেষত পরের দুঃখের এবং বিষাদের কথা কতক্ষণ মনে থাকে? বুসি অবিলম্বে ববিলীরাজত্বের বন্দোবস্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিজয়বঙ্গের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তিনি বুসির হস্ত হইতে সে রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দুই তিন দিন গত হইল, তখন পর্য্যন্ত তাম্বু উঠে নাই, সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া, বিশেষতঃ বিজয়বঙ্গ অতীব মনের সুখে অবস্থিতি করিতেছেন। এমন সময়ে তৃতীয় দিন রাত্রিকালে নিস্তব্ধ তাম্বুর মধ্যে ভয়ানক একটা কোলাহল উঠিল, বিজয়বঙ্গের তাম্বু হইতেই সেই কোলাহল শ্রুত হইল। সকলে দৌড়াইয়া গেল, গিয়া দেখিল, দুইটী সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ বিজয়বঙ্গকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। হরিষে বিষাদ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। একার্য্য কে করিল? অনুসন্ধানের পর অবগত হওয়া গেল যে শত্রুকর্ত্তৃক দুর্গজয়ের পর বঙ্গরাওর চারিজন অনুচর পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। এই তিন দিন তাহারা নিকটস্থ জঙ্গলে লুক্কায়িত ছিল, অবসর বুঝিয়া অদ্য রাত্রিতে আসিয়া বিজয়বঙ্গের প্রাণ সংহার করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিয়াছে। তাম্বুস্থ লোকেরা যখন আসিয়া তাহাদিগকে ধরিল, তখন তাহারা বিজয়বঙ্গের ছিন্নভিন্ন এবং রক্তাক্ত দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ দেখ, এখন আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।" সকলে তখনই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, ইহা বলা বাহুল্য; অপর দুই জনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহাদের চারিজনের পরামর্শ এইরূপ ছিল, যে যদি পূর্ব্বগত দুইজন নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে অপর দুই জন কোন প্রকারে বিজয়বঙ্গের প্রাণ সংহার করিবে।

কি ভয়ানক ব্যাপার!

মাস সমালোচন।

গত মাসের প্রধান সম্বাদ লর্ডরীপণের ভারত ত্যাগ এবং লর্ড ডফ্রিনের আগমন। লর্ডরীপণের ভারত ত্যাগ যেরূপ অসাধারণ ঘটনা তাহার উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট হইবে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক এবং আমাদের ক্ষমতাতীত।

ভোটের উপর ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি, যে সেরূপ ঘটনা ভারতবর্ষে আর কখন ঘটে নাই, এবং লর্ডরীপন ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণের নিকট যে সম্মান এবং অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন এবং যেরূপ কোটী কোটী লোকের আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গবর্ণর জেনেরলের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। এখন আমরাও আমাদের দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন করুন এবং তথায় যাইয়া পরম সুখে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করুন।

লর্ডরীপণের অভ্যর্থনার জন্য সমগ্র দেশের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব কারখানাটা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতবাসী ইংরাজেরা অবাক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান মুখপাত্র মাননীয় ইংলিসম্যান এবং পাইওনিয়র প্রথমতঃ স্থির বুঝিয়াছিলেন যে যাহা কিছু হইতেছে তাহা হুজুকমাত্র, কতকগুলা উষ্ণমস্তিষ্ক রাজদ্রোহী শিক্ষিত যুবকেরা কেবল গোলযোগ করিতেছে মাত্র - দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের তাহাতে যোগ কিম্বা কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, কিন্তু যখন দেখিলেন যে কেমন একপ্রকার বৈদ্যুতিক বলসঞ্চারে যেন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিল, ধনি দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই একমন একপ্রাণ হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়া উঠিল, তখন তাঁহাদের মনে বিশেষ আঘাত লাগিল; তখন মাথাচুলকাইয়া গম্ভীর চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বাস্তবিক যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সত্য কিনা, এবং তাহার ভিতরে কোন পদার্থ আছে কিনা। পাইওনিয়র পত্রিকায় সম্প্রতি এই সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক সেই প্রবন্ধে এই বিষয়টির অতি বিশদ সমালোচনা করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর বর্ত্তমান মনের অবস্থা আজকাল কিরূপ, এবং তাহাদের সম্বন্ধে এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ রাজনীতি হওয়া উচিত তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ যে আমাদের পাঠকবর্গ সকলেই সেই প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

লেখক যাহা কিছু বলিয়াছেন সে সমস্তই আমরা অনুমোদন করি। তিনি বলেন যে ভারতবাসীরা এখন আর পূর্ব্বের মত অসভ্য অজ্ঞ কিম্বা নিশ্চেষ্ট নাই, তাহারা এক্ষণে সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে এবং আপনার পাওনা বুঝিয়া লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এখন তাহাদিগকে জোর করিয়া দাবাইতে চেষ্টা করিলে তাহাতে রাজ্যের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই। আপনাদিগের জাতীয় সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই অবশ্য ইংরাজেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন এবং সেই অভিপ্রায়েই তাঁহারা এত কাল রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে অভিপ্রায় পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিলে চলিতেছে না। এখন ভারতবাসী এবং ইংরাজ এতদুভয়েরই স্বার্থ এক করিতে হইবে, এবং সকল বিষয়েই সাধ্যমত সাম্যনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ইংরাজ বিজেতা, অতএব ইংরাজের জন্য এক আইন, এক প্রকার নিয়ম, এক প্রকার স্বস্বাধীনতা আর ভারতবাসী বিজিত, তাহার জন্য অপর

আইন, অপর নিয়ম, এবং অপর প্রকার স্বত্বস্বাধীনতা, আর এরূপ হওয়া উচিত নহে। এখন উভয়কেই বলিতে হইবে যে তাহারা উভয়েই সমান, উভয়েই এক রাজার প্রজা, এবং উভয়েই সম সুখ দুঃখ ভোগী।

লর্ডরীপণ গবর্ণর জেনরল হইয়া তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই ভারতবর্ষবাসী দিগকে এই কথা বলাইতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় আদর করে নাই, বরঞ্চ সকলে বাক্যবাণে তাঁহার উদারতার জন্য তাঁহাকে অপমান পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু যাহারা এরূপ অবৈধ আচরণ করিয়াছিল তাহারা স্বপ্নেও একবার ভাবে নাই যে এত শীঘ্র অসম্ভাবিত রূপে তাঁহার সে কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে, এত শীঘ্র তাহা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। সত্যের কি অনিবার্য্য প্রভাব যে ক্রমে অলক্ষিত ভাবে সে লোকের মনে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া লয়। ইলবার্টবিল পাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াই হউক কিম্বা সায়ত্ব শাসন প্রথা প্রবর্তিত করিবার উদ্যোগ করিয়াই হউক লর্ডরীপণ যত দিন ইংরাজদিগকে বলিতেছিলেন যে তোমরা সাবধান হও, অন্যায় প্রতিরোধ করিও না, ভারতবাসীদিগকে মনুষ্যোচিত স্বত্বস্বাধীনতা প্রদান কর, ততদিন তাঁহার সে কথা অতীব অপ্রিয় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহা শোনা দূরের কথা, তিনি তাহা বলিয়াছেন বলিয়া সকলে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল, কিন্তু এখন যাইবার সময় লোকের গতিবিধি কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সে কথা উচিত এবং ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লর্ডরীপণ অতি অবিবেচক, অতি আহম্মক, অতি ভারতবর্ষপ্রিয়, ইংরাজেরা এতদিন তাহাই বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এখন কি আর কেহ সেরূপ বলিতে সাহস করিবেন? আমাদের তাহা বোধ হয় না, কেননা তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পাইওনিয়রে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত না।

লর্ডরীপণের অভ্যর্থনা সংক্রান্ত ব্যাপার সমস্ত দর্শন করিয়া ইংরাজদিগের মনে যে এরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে ইহা আমাদের পক্ষে অতীব আহ্লাদের বিষয়। এক্ষণে এই ভাবটি যাহাতে অন্তর্হিত না হয়, বরঞ্চ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে তাহাই বাঞ্ছনীয়। ইহা করিবার জন্য ইংরাজ এবং ভারতবাসী উভয়েরই চেষ্টা করা উচিত। কলহ বিবাদ অশান্তি অসৌজন্য আর না থাকে, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, পরস্পরে এক্ষণে তাহা বিস্মৃত হইতে হইবে, এবং উভয়েই এক রাজার প্রজা এবং সম-সুখ দুঃখ ভোগী এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। দেশী লোকেরা যে আগ্রহের সহিত এরূপ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কেননা তাহারা কোন কালেই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না; ইংরাজের হস্তে তাহারা যে শত সহস্র উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা নিয়তই মহা কৃতজ্ঞ এবং এখনও দীন অন্তঃকরণে তাঁহার পদতলস্থ হইয়া আরও উপকার এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে তাহারা প্রস্তুত; কিন্তু অপর পক্ষ বিজেতা ইংরাজ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেই আমাদের ভয়। তাঁহারা বড় উদ্ধত, এবং তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়েই আমাদিগকে ঘৃণা

করিয়া থাকেন; আমাদিগকে নিকটে আসিতে দেন না, আসিলে পদাঘাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু এরূপ করিলে আর উভয়ের কাহারও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। দেশীলোক উঠিবেই উঠিবে; যদি ইংরাজ হাতে ধরিয়া উঠান, তাহা হইলে তাঁহার উপর লোকের ভক্তি থাকিবে, তাঁহার রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবে, আর যদি তাহা না করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতবাসী এবং ইংরাজের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা এবং সম্বর্দ্ধন করার ভার এক্ষণে আমাদের নবাগত লাটসাহেব লর্ড ডফ্রিণ বাহাদুরের উপর অশেষ পরিমাণে নির্ভর করিবে। একপক্ষে ইংরাজকে বুঝাইতে হইবে, অপর পক্ষে লর্ড রীপণ প্রবর্ত্তিত নীতি অক্ষুন্ন রাখিয়া দেশীয়দিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে এবং তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পরমেশ্বরের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে লর্ড ডফ্রিণের মতি গতি যেন সর্ব্বতোভাবে এইরূপই থাকে। দেশের যেরূপ অবস্থা, লোকের মনের যেরূপ চাঞ্চল্য, তাহাতে তিনি একটু বক্রভাব ধারণ করিলে যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লর্ড রীপণ আশ্বাস দিয়া মনের আশা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে এক্ষণে লর্ড ডফ্রিণের দিকে তাকাইয়া আছে। এখন তিনি সানুকূল হইলেই উদারনীতি অবলম্বন করিয়া চলিলেই সকল দিক বজায় থাকে।

লর্ড ডফ্রিণের রাজত্বে এখন কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। কিন্তু দুই একটী বক্তৃতা যাহা তিনি করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশান্বিত বই নিরাশ হই নাই। বোম্বাই হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত তিনি কয়েকটি অভিনন্দন পত্রের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, সে সমস্তেই তিনি দেশবাসীদিগের উপর যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন বিষয়বিশেষে মত প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু মোটের উপর বলিয়াছেন যে, লর্ড রীপণ যে নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তিনি সাধ্যমত তাহাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিবেন না, বরঞ্চ যাহাতে সেই নীতির যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয় তাহারই চেষ্টা করিবেন। স্বায়ত্বশাসনপ্রথা সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তাহার উপর তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না। এক্ষণে দেখা যাউক কি ঘটে।

PRINTED AND PUBLISHED BY NERODE CHUNDER MOOKERJEE AT THE DURBHUNGA TRADING CO.'S, "UNION PRESS."

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল; ফাল্গুন, প্রথম পক্ষ। [২১ সংখ্যা।

সিদ্ধান্তবাগীশের টোল।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

বর্ণসৃষ্টি সম্বন্ধেও পুরুষসূক্তে ঐ রূপ প্রয়োগ আছে। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃত। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। যজ্ঞের নিমিত্তে ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন, ক্ষত্রিয়কে তাঁহার বাহু করা হইয়াছিল বৈশ্য তাহার উরুদেশ হইল, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। এস্থানে যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে ইঁহার এক এক অঙ্গস্বরূপ কহিলেন শূদ্রকে সেরূপ পদস্বরূপ না কহিয়া পদ হইতে "উৎপন্ন" কহিলেন। এই একই বচনে দুই প্রকার প্রযোগ বিরোধ জ্ঞাপক নহে। অতএব "পদ্ভ্যাং পৃথিবী ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন তাঁহার পদের জন্য পৃথিবীকে গ্রহণ করিয়াছেন সেইরূপ পুরুষ সূক্তেও তাঁহার মহিমাস্তব প্রদর্শনার্থ পদের জন্য শূদ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ শূদ্রই তাঁহার পদস্বরূপ। এই রূপ তাৎপর্য্য স্থানে স্থানে ঋষিরাও গ্রহণ করিয়াছেন যথা বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় সমস্যা-প্রকরণে ১৮৯ অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে। নারায়ণ কহিতেছেন "ব্রহ্মবক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রম্ ঊরূ মে সংশ্রিতাঃ বিশঃ। পাদৌ শূদ্রা ভবন্তীমে বিক্রমেন ক্রমেণ চ॥" আমার শক্তিদ্বারা ক্রমপূর্ব্বক আমার মুখ ব্রাহ্মণ আমার ভুজদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য, এবং চরণযুগল শূদ্রস্বরূপ হয়েন।—এ স্থানে লক্ষণা প্রয়োগদ্বারা এমত তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে ঈশ্বরের মুখ, ভুজ, উরু, চরণ হইতে ক্রমশঃ ঐ সকল বর্ণ জন্মিয়াছে। কিন্তু অভিপ্রায় এই যে, বিরাটদৃষ্টিতে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল যেমন তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, সেই রূপ বর্ণচতুষ্টয়ও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। বেদও সেই প্রকার তাঁহার সৃষ্টির বহির্গত হইতে পারে না। অতএব তাহা তাঁহার বাক্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বাক্য ও মুখের কার্য্যকারণাত্মক অভেদ লক্ষণায় সেই বেদবাণীই তাঁহার মুখোৎপন্ন করিয়া কথিত হয়। তাহাই আবার পক্ষান্তরে তাঁহার মুখ

কল্পনার হেতু। সেই মুখকে চারি বেদ অনুসারে চারিটি বলিলেও হয়, আবার "সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ" এবং বেদেও সহস্র সহস্র শাখা বিশিষ্ট বিধায় তাঁহার সহস্র মুখ কল্পনা করিলেও হয়। এতদুর কেবল প্রসঙ্গাধীন অতিরিক্ত বলা হইল। শাস্ত্রের মূল অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মই বেদের যোনি, এবং তিনি যেমন সর্ব্বত্রব্যাপী তেমনি বেদেতেও ব্যাপ্ত আছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এইরূপ সিদ্ধান্ত কি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্বের বাধক? কেননা মন্ত্রবর্ণে কহিয়াছে" 'বাচাবিরূপনিত্যয়া" বেদরূপবাণী নিত্য। ইহার উত্তর এই যে "ব্রহ্মই বেদের যোনি বা কর্ত্তা। বেদ স্বতন্ত্ররূপে স্বয়ম্ভূ বা নিত্য পদার্থ নহে। এই সকল যথাশ্রুত অর্থ আপাততঃ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যতার বাধক হইলেও ঐ উভয় প্রকার প্রয়োগের যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবার্থ তাহা অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় পরস্পর অন্বিত। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার ভাবার্থকে সামঞ্জস্য করিলে অধিকার ও ও দৃষ্টিভেদে বেদ নিত্যও হন অনিত্যও হন। অপৌরুষেও হন পৌরুষেয়ও হন। প্রকৃতি বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকৃতও হন ঋষিপ্রণীতও হন। এই প্রকার নানা অধিকার ও দৃষ্টির মধ্যে যেটির প্রতি যে মহাজনের অসাধারণ অনুরাগ ছিল তিনি সেই অধিকার বা দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদকে তদনুযায়ী কৃত বা অকৃত বিশেষণ দিয়াছেন। ফলে এ বিষয়ে সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত যে নিগূঢ় সিদ্ধান্ত তাহাই ধারণ করিতে হইবে। সমস্ত বিপ্রতিপত্তি-বিচারের ফলস্বরূপে যদি সেই নিগূঢ়সিদ্ধান্ত লাভ হয় তবেই শাস্ত্রের সার্থক্য হয়, আর্য্যধর্ম্মের সার্থক্য হয়, মানব জন্মের সাফল্য হয়, এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের ফল হয়। নতুবা ভারতের সন্তান হইয়া দুর্ভাগ্যক্রমে যদি জানিলাম যে, আমাদের শাস্ত্র সকল পরস্পর অনৈক্য আমাদের ভারতজননীর বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন মতকৃত ঋষিগণ, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি ও দর্শনকারগণ, ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র সকল পরস্পর বিপ্রতিপত্তিভাবে পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রার্থরূপ স্বামিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন তবে আমাদের মনে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি বিস্তর অনাদর জন্মে। এই বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দিকে তাদৃশ অনাদরই দৃষ্ট হইতেছে এবং সেই ঘোরতর অনাদরের প্রবল বিপ্লাবক স্রোতে এখন ভারতে যথাসর্ব্বস্ব ভাসিয়া চলিল। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রগত অভিপ্রায়ের ঐক্যরূপ পরমসিদ্ধান্ত ধারণ করা হিন্দু মাত্রের কর্ত্তব্য। গীতার উপক্রমণিকায় পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন "দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ" বেদোক্ত ধর্ম্ম অধিকার ভেদে দুইপ্রকার। "প্রবৃত্তি লক্ষণ নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ"। এক প্রবৃত্তি লক্ষণ, দ্বিতীয় নিবৃত্তি লক্ষণ। "তত্রৈকোজগতঃ স্থিতি কারণং" তন্মধ্যে প্রথম যে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম তাহাই জগতের স্থিতির হেতু। প্রজাপুত্রদাসদাসীকামী, আয়ুরারোগ্যবীর্য্যকামী, রাজ্যধন ঐশ্বর্য্যকামী, যশোবিজয় মহত্বকামী, এবং সুখসৌভাগ্যস্বর্গকামী প্রভৃতি ফলাসক্ত জনগণের সম্বন্ধে সংসারগতিভূত, জগতের স্থিতির কারণস্বরূপ, মানবস্বভাবের দর্পণস্বরূপ, প্রবৃত্তিলক্ষণবিশিষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, এই প্রকার অসংখ্যাসংখ্য ফলকামী জনগণের কামনা পূরণের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে যদি বেদে [illegible] [illegible]

নিষ্কাম ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা থাকিত তবে কয়জন লোক তাহাকে গ্রহণ করিত। সুতরাং প্রায় সকলেই শাস্ত্র শূন্য থাকিত। বিধিব্যবস্থা শূন্য রাহু রাজ্যের ন্যায় শাস্ত্রশূন্য কামনারাজ্যে অরাজক উপস্থিত হইত। এই সকল কারণে বেদশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে ফলার্থ প্রার্থনাস্বরূপ যে সকল যজ্ঞীয় মন্ত্র মানবের প্রার্থনাবাণীর আদর্শ ও নিদর্শনরূপে বেদে নিবেশিত আছে, সেইরূপ প্রত্যেক মন্ত্রই দেবতারূপী। দেবতা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। কিন্তু যখন সে মন্ত্র মানব স্বভাবের আদর্শ তখন মানবের প্রার্থনার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার অভ্যুদয় হয়। অতএব প্রার্থনাবাণীরূপ মন্ত্র তদধিষ্ঠাতৃদেবতা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে মানবের কামনাশীলস্বভাবজাত। সুতরাং মন্ত্রই দেবতারূপে বরণীয় হইয়াছেন। মন্ত্রময় ক্রিয়ার অবসানে বর্ণাত্মক শব্দরূপী মন্ত্র বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু জীবের বাসনার ভাণ্ডার স্থানে "অপূর্ব্ব" বা অদৃষ্টরূপে ঐ ক্রিয়ার ফল ও মন্ত্রময় প্রার্থনার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং দেবতাও তথায় অধিষ্ঠাতৃ ও ফলদাতারূপে বাস করেন। এইরূপে দেবাধিষ্ঠাতৃত্ব স্বর্গাবতরিত নহে, কিন্তু সকামী জনের কামনা বা প্রার্থনাবাণীরূপ মন্ত্রের সহজাত। লোক লোকান্তর গামীকামীজনের প্রার্থনাস্বভাব নিত্য সুতরাং প্রার্থনাবাণীরূপ বেদবাণী ও তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা নিত্য। যখন জীবের ভক্তি বা জ্ঞান পথ পরিষ্কৃত হয়, তখন একই ভগবানকে সর্ব্বদেব ও সর্ব্বমন্ত্রময় রূপে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইয়া জীব কর্ত্তৃক বাসনা ও নানারূপ দেবত্ব পরিত্যক্ত হয়। সে অবস্থায় মানব জ্ঞানেতেই সিদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে গীতার এই বচন লগ্ন হয় যথা—

"যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্ম তৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্ট স্তস্যকার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তোষ তাদৃশ ভোগাদি অপেক্ষা রহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কোন ক্রিয়া বা পূজা পাঠ নাই। উত্তরগীতায় কহিয়াছেন "তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান পাষাণ মৃণ্ময়ান। যোগিণো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যান পরায়ণাঃ॥ আত্মধ্যান পরায়ণ যোগিরা জলরূপি তীর্থ এবং পাষাণ ও মৃণ্ময় দেবতা সকল অবলম্বন করেন না। "জ্ঞানা মৃতেন *তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ। নচাস্তি কিঞ্চিৎ* কর্ত্তব্য মস্তিচেন্ন সতত্ত্ববিৎ॥" জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত কৃতকৃত্য যোগির কিছুমাত্র ক্রিয়া নাই, যদি থাকে তবে তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন। পুনশ্চ আত্মজ্ঞান নির্ণয়ে কহিয়াছেন

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞৈদ্যন্তপোভির্নিয়মৈর্ব্রতৈঃ"॥

যাঁহার চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ পরম জ্ঞান বিরাজ করে, তাঁহার জপ যজ্ঞ তপঃ নিয়ম, ব্রতাদিতে কি প্রয়োজন। এইরূপ নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য গীতা ভাষ্যের উপক্রমণিকায় কহিয়াছেন "প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স হেতুর্যঃ সধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণ্যা দ্যৈর্ব্বর্ণৈরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়র্থিভিরনুষ্ঠীয়মানোদীর্ঘেণ কালেন" যে ধর্ম্ম প্রাণিগণের সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুষ্ঠীয়মান তাহাই নিবৃত্তি ধর্ম্ম। যাহাদের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহাদের কেবল ব্রহ্মেতেই রতি, সুতরাং প্রবৃত্তি লক্ষণ বিশিষ্ট বৈদিক ধর্ম্ম বা ভক্তিপূর্ব্বক সগুণোপাসনা তাঁহাদের অধিকারে যুক্ত হয় না। এজন্য বেদে

তাঁহাদের অধিকার অনুযায়ী নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ও পূর্ণ সন্ন্যাস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যবস্থা আছে। সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে তাঁহাদের পক্ষে বেদের প্রয়োজন রহিত হয় যথা উত্তর গীতায় লিখিয়াছেন"যথামৃত ন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং। এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদেনাস্তি প্রযোজনং॥" সেরূপ অমৃত দ্বারা তৃপ্তব্যক্তির জলের প্রয়োজন নাই সেইরূপ পরমাত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বেদে প্রয়োজন নাই। বৈদিক ধর্ম্মের এই দ্বিবিধ লক্ষণ প্রদর্শিত হইল। এই উভয়বিধ লক্ষণবিশিষ্ট ধর্ম্মই স্বাভাবিক। ফলকামনা যেরূপ স্বাভাবিক স্বার্থশূন্য ব্রহ্মজ্ঞানও সেই রূপ স্বাভাবিক। সুতরাং তদুভয় লক্ষণ বিশিষ্ট মানব স্বভাবের নিদর্শন ও ব্যবস্থা স্বরূপ বেদও স্বাভাবিক। সেই ব্রহ্মজ্ঞানাভাবে বাসনার অন্ত নাই। সুতরাং বাসনা জন্য সাধনারও শেষ নাই। কত প্রলয় হইবে, জীব সেই বাসনা বীজ হৃদয়ে ধরিয়া ঐ সাধনার ফলভোগার্থ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিবেন। আবার সেই বীজ হইতে নূতন নূতন বাসনা ও তদনুযায়ী নূতন নূতন সাধনা প্রবাহিত হইবেক। সুতরাং মানবের বাসনা ও তদনুগত ক্রিয়া নিত্য। তাহার নিদর্শন ও ব্যবস্থা স্বরূপ বেদও নিত্য। বর্ণাত্মক এবং ধন্যাত্মক শব্দ বিশিষ্ট এবং পদক্রম সূক্ত প্রভৃতি বিভাগবিশিষ্ট বেদ নামক গ্রন্থ যে নিত্য শাস্ত্রের এমত অভিপ্রায় নহে। বেদের তাৎপর্য্য নিত্য ইহাই অভিপ্রায়। কেননা মরণ ধর্ম্ম রহিত জীবের নিত্য স্বভাবের সম্বন্ধে বেদ আদর্শ, নিদর্শন ব্যবস্থাস্বরূপ বাসনাজালে বদ্ধ জীবগণ বাসনা জন্য ক্রিয়াচক্রে কল্পকল্পান্ত ব্যাপী পর্য্যায়ক্রমে ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। "যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণিপর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবাযুগাদিষু।" বিষ্ণু পুঃ ১।৫৬৪ এই বচনের টীকায় স্বামী লিখিয়াছেন,—'নন্বদেবাদীনামনিত্যানাং কথং নিত্যেন বেদেনাভিধানং ইত্যাশঙ্ক্য প্রবাহনিত্যত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি।" অর্থাৎ বেদেতে অনিত্য দেবতাদিগের উল্লেখ থাকায় বেদ নিত্য হইতে পারে না এই আশঙ্কা নিবারণার্থে কহিতেছেন যে প্রবাহরূপে বেদ নিত্য হযেন। তাহার দৃষ্টান্ত যথা বসন্ত প্রভৃতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, তত্তৎকালীয় ফল পুষ্পাদি আবির্ভূত হইতে দেখা যায়, তাহার ন্যায় প্রত্যেক কল্পেই পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সমুদয় বস্তু স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রবাহরূপে সকলই নিত্য চক্রের আবর্ত্তে পতিত হইয়া প্রতিবর্ষে পূর্ব্ববর্ষের তুল্য ষড়ঋতুর পরিবর্ত্তনের ন্যায়, এক কল্পে পূর্ব্ব কল্পের সদৃশ বাসনা ও কর্ম্ম সকল দেখা দিতেছে; তাহার ব্যবস্থা সকলও পূর্ব্বকল্পের অনুসারে জীবের কর্ম্মের নিয়ামক হইতেছে। সেই সকল ব্যবস্থারূপ ধর্ম্ম জীবের ঐ বাসনা ও কর্ম্ম জন্য অদৃষ্টকে সূক্ষ্মরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে অথচ নিত্য আদর্শ ও নিদর্শনরূপে তাহার নিয়ামক ও উত্তরসাধক হয়। সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের নামই বেদ। প্রতিকল্পের আরম্ভে সেই ধর্ম্মসকল ক্রিয়া ও ব্যবস্থারূপে যেন নূতন শক্তি সহকারে আদি কর্ম্মকুশল ঋষিগণের হৃদয়ে স্ফূরিত হয়। ঋষিরা তাহার শক্তিতে মোহিত হইয়া পূর্ব্ববৎ পবিত্র বর্ণাত্মিকা বাণীদ্বারা মহানন্দে তাহা গান করিয়া থাকেন। পশ্চাৎ বংশবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল

ক্রিয়ার নিদর্শনস্বরূপ, প্রার্থনা, যজ্ঞ, গান, ও অভিচারিক মন্ত্র সকল শ্রুতি পরম্পরা লিপীকৃত, শ্রেণী ও শাখাবদ্ধ হইয়া জন সমাজে ঋক্‌, যজুঃ সামাথর্ব্বাদি মন্ত্র ব্রাহ্মণ ময় বেদরূপে আদরণীয় হয়। ঋষিরা মানবের নিত্যস্বভাবগত সেই বেদের অব্যক্ত ও ব্যক্তাবস্থার সমষ্টিভাব গ্রহণপূর্ব্বক অতি দূরদর্শিতা সহকারে তাহাকে নিত্য বলিয়াছেন। জীব যদি নিত্য হয়, জীবের ধর্ম্ম যদি নিত্য হয়, কল্প কল্পান্তর ব্যাপী সৃষ্টি যদি নিত্য হয়, তবে ধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ অব্যক্ত ও স্ফোটাত্মক বেদবাণিও নিত্য হইবেক। বর্ণ ও শব্দের নিত্যতা না থাকিলেও তাহার শক্তি ও স্ফোট নিত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা অমর জীবগণ স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টের মধ্যে কল্প কল্পান্তর ব্যাপী তাহা বহন করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে পরিণত করিয়া থাকে। সুতরাং শব্দ বা বেদ নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের অঘটন ঘটনপটীয়সী আদ্যন্ত রহিতা সৃষ্টিশক্তির অলৌকিক প্রভাবে সৃষ্টিনিত্য। কত প্রলয় হইয়াছে, হইবে, আবার সৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে, পাইবে। সুতরাং সৃষ্টি নিত্য। ঐরূপ প্রলয় ও প্রকটনশীল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীব ও তাঁহার বাসনা জন্য কর্ম্মও নিত্য এবং কর্ম্মের নিদর্শন ও নিয়ামক বেদও নিত্য। প্রত্যেক কল্পে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাধি বিশিষ্ট পরব্রহ্ম স্বকীয় সৃষ্টি শক্তিতে আরোহণ পূর্ব্বক নির্লিপ্তভাবে যেমন পূর্ব্ববৎ সমস্ত সৃষ্টি এবং তাহার সহিত জীবকে প্রকট করেন সেইরূপ জীবের বাসনাপূরিত হৃদয়দ্বার দিয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়ামক বেদকেও প্রকাশ করেন। সেই প্রকাশ ক্রিয়া তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না এবং তাহা তাঁহারই প্রত্যাদেশস্বরূপ সুতরাং উক্ত হইয়াছে তিনিই বেদের কর্ত্তা। কিন্তু তিনি নিজে ফলাশক্তির অভাব বশতঃ নির্লিপ্ত বিধায় অকর্ত্তা। নবকর্ত্তৃত্বের অবশ্যম্ভাবিফলস্বরূপ ভোক্তৃত্বের ন্যায় কোন দোষ তাঁহাতে না অর্শে এজন্য শাস্ত্রে নবস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত তাহার সৃষ্টিশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিকেই যেমন জগতের সেইরূপ বেদেরও কর্ত্রিরূপে কহিয়াছেন। আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পব্যাপী প্রকৃতির রূপান্তরস্বরূপ, কর্ম্মফল স্বরূপ, ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরূপ জীবের স্বভাব, অদৃষ্টকে আশ্রয় পূর্ব্বক নিয়ামকরূপে অব্যক্তভাবে বেদ থাকেন বিধায় স্বভাব বা অদৃষ্টই বেদের কর্ত্তারূপে কথিত হয়েন। বিশেষতঃ যাহা স্বভাবতঃ হয় তাহা আপনিই হয়, এই দৃষ্টি লোকেতে প্রচলিত আছে। তদনুসারে প্রতি কল্পে বেদ আপনি নিজ শক্তিতে প্রকাশিত হয়েন বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। মহর্ষি কপিল কহিয়াছেন নিজ শক্ত্যভিব্যক্তে স্বতঃ প্রামাণ্যং। বেদ নিজশক্তিতেই অভিব্যক্ত এবং আপনিই আপনার প্রমাণ। "তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ"। বেদের কোন ইষ্টসাধন তৎপর-বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ত্তৃপুরুষ নাই। "যস্মিন্নদৃষ্টেঽপিকৃতবুদ্ধিরূপজায়তে তৎপৌরুষেয়ম্" যে কার্য্যে বুদ্ধি প্রয়োজন হয় তাহাই পৌরুষেয়। কিন্তু বেদ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় জীবন বীজপুরুষ বা সমষ্টি পুরুষ স্বরূপ স্বয়ম্ভুব্রহ্মার সকাশ হইতে জীবের অদৃষ্ট বশতঃ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে। কপিলের এই অভিপ্রায় বেদবিরোধী নহে। কেননা বেদে আছে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্বদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ"

অর্থাৎ এই মহতপুরুষের নিশ্বসিত এই ঋগ্বেদাদি হয়েন”। এস্থানে শারীরক ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন। “সর্ব্বজ্ঞানাকরস্ত প্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষ নিশ্বাসবদ্যস্মান্মহতোভূতাৎ যোনেঃ সম্ভবঃ” সর্ব্বজ্ঞানের আকর ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সকল নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ অবলীলাক্রমে যে মহৎ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাৎপর্য্য এই যে নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন পুরুষ হইতে বিনাকর্ত্বত্বে বিনা যত্নে অবলীলাক্রমে উৎপন্ন হয়, সকল জীবের সমষ্টি অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর হইতে জীবের অদৃষ্টযোগে অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সকল সেইরূপ আপনা আপনি স্বাভাবিকধর্ম্ম নিয়মে উৎপন্ন হই যাছে। তাহাতে ঈশ্বর বা জীবের মধ্যে কাহারোই বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব নাই। এতা-বতা ঈশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়মই বেদের জনক। এতাদৃশ ভাবে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ অকৃত বলিয়া অভিহিত হয়েন। আবার ঋষিগণের স্বভাবই ঐ বেদের উৎপত্তি স্থান এবং তাঁহাদের কণ্ঠসিস্থত বাণীই তাহার প্রকাশক বিধায় ঋষিরাও বেদকৃত, মন্ত্রকৃত বা বেদের দ্রষ্টা বলিয়া কথিত হন। কিন্তু ঈশ্বরই নিয়ন্তা বিধায় তিনিই কর্ত্তা। ফলতঃ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব দ্বারা বেদ অনিত্য হয় না। কেননা তাহা তাঁহার সৃষ্টিনিয়া-মক সমষ্টি ব্যষ্টিভেদে নিত্য প্রকৃতি ও নর-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হইলে বাসনাবীজোৎপন্ন ও বাসনা বীজগর্ভ ক্রিয়ার অধিকার হইতে মানব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে যুক্ত হয়েন। সে অবস্থায় প্রবৃত্তি বিধি কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদকে অথবা প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞানে আরোহণের জন্য নিবৃত্তি বিধি জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদকে তিনি আর আশ্রয় করেন না। এ নিমিত্তে তাঁহার দৃষ্টি হইতে তখন বেদবাণী ইন্দ্রজালবৎ ধ্বংস হইয়া যায়। তৎপ্রতি অনপেক্ষা বশতঃ তদ্বারা আর তাঁহার চরিত্র, স্বভাব, বা অদৃষ্ট সংরচিত হয় না। তাঁহার আর জন্মও হয় না, তাঁহার সহিত বেদও আর জন্মেন না। তাঁহার আত্মা সে অবস্থায় সর্ব্ববেদবেদান্তের অতীত ব্রহ্মে অবস্থিতি করে। অদৃষ্টের ফলভোগ করে না। সুতরাং সে অধিকারে সৃষ্টি ও বেদ অনিত্য, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার মানবাধিকার আশ্রয় পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ বেদকে ব্রহ্মকৃত, ঈশ্বরকৃত, ব্রহ্মাকৃত, প্রকৃতিকৃত, স্বভাবকৃত, অদৃষ্টকৃত, ঋষিকৃত, নিত্য, অকৃত, অপৌরুষেয়, আপনা হইতে অভি-ব্যক্ত এবং অনিত্যও কহিয়াছেন। সৃষ্টি যেমন অনাদিও বটে, সাদিও বটে, বেদও সেইরূপ অপৌরুষেয়ও বটে, নিত্যও বটে, নিজশক্তিতেও অভিব্যক্ত বটে, অদৃষ্টোৎপন্নও বটে আবার পৌরুষেয়ও বটে, ঈশ্বরকৃতও বটে এবং অনিত্যও বটে। হে পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ কর আশার অতীত আনন্দ লাভ করিবে।

বঙ্গীয় নবীনকবি ও কাব্য।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(যে স্থলে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা মন্থরগামিনী, সেই স্থলে আর একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, ভাবের ঘূর্ণাবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া, স্থানবিশেষে তাঁহার কল্পনা তরলগতি দামিনীর ভাব ধারণ করে—আকাশের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যদি কোন মহাপুরুষ প্রদোষের প্রতিমূর্ত্তি ঘুরাইতে থাকেন তাহা হইলে সেই ঘূর্ণমান প্রদোষ প্রতিকৃতির সৌন্দর্য্য যেমন অনেকে উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের নবীনকবি রবীন্দ্রনাথের প্রদোষরূপিণী কল্পনা যখন ভাবের আবর্ত্তনে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ছুটিয়া যায় তখন তাহার শোভা অতি অল্প লোকেই অনুভব করিতে সক্ষম হয়।

রবীন্দ্রনাথের "অনন্তমরণ" "বিস্মৃতি" হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, চিন্তার সম্প্রসারণ জনিত পরিশেষে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এই কবিতাটীর মধ্যেই তাঁহার কল্পনা বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়াছে যতবার পড়িবে ততবারই চঞ্চল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে স্থির সৌন্দর্য্য অনুভব হইবে না। যথা—

"ভাবিতেছি কল্পনায়, কতকাল গেছে চলে,
বয়ঃক্রম সহস্র বরষ।
মরণের স্তরে স্তরে, অতিদীর্ঘ দীর্ঘপ্রাণ
কোন শৃঙ্গ রয়েছে পরশ।
হয়ত গিয়েছি আমি কত শত গ্রহ ছুঁয়ে
বৃহস্পতি গ্রহের মাঝারে
জীবনের এক প্রান্ত রয়েছে পৃথিবীমাঝে
শেষপ্রান্ত বৃহস্পতি পারে।
এরা যা গণেছি বসি সহস্র মরণ রাশি
দীর্ঘকায় মরণ তাপস।
সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে অন্ধকার ছুটিতেছে,
শ্রান্তদেহ হয়েছে অবশ॥")

"বিস্মৃতি" হইতে কেমন এক মহতী চিন্তা কবির চিত্তে সমুদিত হইয়াছে, এইরূপ চিন্তার বিষয় অনুভব করিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণও বিস্তৃতভাব ধারণ করে। এইরূপ কবিতা-কোন প্রসিদ্ধ কবি দুটী পংক্তি না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছেন না—

'Strains that might create soul
Under the ribs of death"

উপরিউক্ত কবিতার পর "অনন্তমরণের আর এক স্থলে ভাবের এক অতি আশ্চর্য্য উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

"সহস্র বরষ পরে সেই গ্রহ মাঝে বসি
না জানি গাইব সে কি গান!
কি অনন্ত মন্দাকিনী না জানি ছুটিবে যবে,
খুলে যাবে সে বিশাল প্রাণ
মরণের সঙ্গীত মহান্!

হয়ত বা সে নিশীথে কবি এক পৃথিবীতে
চেয়ে আছে মোর গ্রহ পানে ;
মহান্ সঙ্গীতধারা গ্রহ হতে গ্রহে ঝরি
পশিবেক তাহার পরাণে
বিস্ফারিত কবি আঁখি শিহরিত কলেবরে
শুনিবে সে আধ শোনা গান
কত কি উঠিবে মনে ব্যক্ত করিবার তরে
আকুল ব্যাকুল হবে প্রাণ !
আপনার কথা শুনে আপনি বিস্মিত হবে
চাহিয়া রহিবে অবিরত
নিদ্রাহীন্ সপ্তটির মত।
নয়নে পড়িবে অশ্রুজল,
বুঝিবে না, শুনিবে কেবল।"

ঘুমের যেন একটি পৃথক জগৎ আছে সেই জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা সেলি যেরূপ Rainbowwinged steeds প্রভৃতি লইয়া খেলা করিতেন উষার সুকুমার কোকনদ ছবির ন্যায় নিদ্রাদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিতেন, আমাদের অভিনবকবি-রবীন্দ্রনাথও উপরিউক্ত কবিতামালায় তদ্রূপ কল্পনাসখীর হস্ত ধারণ করিয়া, এক অজানিত গ্রহের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—কল্পনাসখী আমাদের তরুণ বয়স্ক কবিরে নিষ্কাম প্রেমে মুগ্ধ করিয়াছে—উঃ কি উচ্চভাব ! ! যাহা হউক অনন্তমরণের শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত অংশের ন্যায় ওজোগুণ বিশিষ্ট নহে—শেষভাগে কবির কল্পনাসখী গ্রহান্তরের অসীমপথ ঘুরিতে ঘুরিতে যেন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপ ছাড়িতেছেন।

গভীর অন্ধকারে জগৎ ডুবিয়াছিল, হিরণ্ময়ী—জ্যোতির্ম্ময়ী উষা হাঁসির জ্যোতিঃ ছড়াইয়া দিলেন, চরাচর উষার আলোকে ভাসিতে লাগিল—'প্রভাত উৎসব' আরম্ভ হইল—বাতাস ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া, গায় হাত বুলাইয়া যাইতেছে, পাখী, হৃদয়ের সরল গান মনের কাছে আসিয়া শুনাইতেছে, বিশ্বজননী প্রকৃতির সন্তানের ন্যায় কবি মায়ের মত মনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন—মনের আয়তন এত বাড়িয়া গিয়াছে, এত ঔদার্য্যে পূর্ণ হইয়াছে যে, জগৎ যেন সমস্ত উপকরণে একটী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরে এখানে আসিয়া সেই মনকে আলিঙ্গন করিতেছে। বিশালহৃদয়ের ম[illegible]—মান, মর্য্যাদা, দয়া দাক্ষিণ্য, ও প[illegible]পকারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কমিবার আর একটুও আশঙ্কা নাই। প্রকৃতির কি সন্তানের উপর কখন ঘৃণা জন্মে ? এখানে প্রকৃতির হৃদয় প্রাপ্ত কবির মনে ঘৃণা নাই, অভিমান নাই, তাই কবি এক মুখ হাসির সহিত—আদরের সহিত বলিতেছেন—

"ধরায় আছে যত
মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

তার পরেই প্রকৃতি সৌন্দর্য্যবিভোর, কি জানি কি ভাবে বিমুগ্ধ কবি আকাশ পানে চাহিয়া যেন কি এক অভুতপূর্ব্ব পদার্থ দেখিতে পাইতেছেন উষার স্বর্ণরোগ অরুণের মনোহর কিরণমালায় চারি দিকে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে সেই আলো দেখিয়াই পাখী আনন্দে গান গাইতেছে, তটীনী কতরকম ভঙ্গি করে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে—যে দিকে নয়ন ছুটিতেছে, সেই দিক্ হইতে আর যেন দৃষ্টি ফিরিতেছে না। রবি বাবুর

'প্রভাত উৎসব' আনন্দ উৎসবে পূর্ণ; কবির প্রাণ আনন্দময়ী উষার প্রাণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাই কবি দেখিতেছেন—জগতে বিষাদ নাই জড়তা নাই সকলই আনন্দে পূর্ণ। প্রভাতে মনুষ্যহৃদয় স্বতই হর্ষভরে পূর্ণ হইয়া থাকে, এ সময়ে চিন্তা আনন্দের গান গায় আর উষার মত হাসিতে হাসিতে পাখীর মত আকাশ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে পৃথিবীর উপর দিয়া চলিতে থাকে। সুরভিপূর্ণ বায়ুসাগরের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে নবীন কবি বলিতেছেন—

"আযরে আয় বায়ু   যাবে যা প্রাণ নিয়ে,
জগৎ মাঝারেতে   দে রে তা প্লাবিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে   যাইবি দিশে দিশে,
সাগর পারে গিয়ে   পূরবে যাবি মিশে,
লইবি পথ হ'তে   পাখীর কলতান।
যূঁথীর মৃদুশ্বাস
মালতী মৃদু বাস
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ॥"

আহা কেমন স্বর্গীয় বাসনা। সুরভির সহিত প্রাণের মিলন কি অমৃতময়—প্রাণ, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ না হইলে, এমন নিদ্রাময় অথচ ভাবময় সমাপ্তসুখ উপভোগ করিতে কার ইচ্ছা হয়—দুই এক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ আকাশ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছে অমনি বীণাবিনিন্দি—স্বরে কবি বলিতেছেন—মেঘ ধীরি ধীরি একবার নামিয়া আইস, সুনীল আকাশ সাগরে আমার ভাসিতে সাধ হয়েছে, শুধু সাধ নয়, ঐ শোন প্রাণের ভাই আকাশ আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে—মহাশূন্য পরিভ্রমণকারি কবির হৃদয় অমনি বলিয়া উঠিল—প্রাণের আকাশ! আমি ত আর পৃথিবীতে নাই, এই দেখ তোমারই হৃদয় উপধানে আমার মাথা রহিয়াছে (উঃ—কি মনোহর সংস্পর্শ।) আমি সুখের সমাপ্তি পাইয়াছি, আমার প্রাণ সুখের প্রাণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—আর সুখময়ি উষা আমার প্রাণের সহিত তোর প্রভাত মিশাইয়া জগতে প্রাভাতিক আলো বরিষণ কর জগৎ আনন্দে পূর্ণ হোক্।

আবার পূর্ব হইতে উষার সৌন্দর্য্যমাখা জ্যোতিঃ পূর্ণ রবিকে উঠিতে দেখিয়া, মেঘাসীন কবি বলিতেছেন, তুমি আকাশ সাগরের পারে যাইবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও—আমি তোমার সঙ্গে যাব আকাশ সাগরের পারে যেতে আমার বড় সাধ হয়েছে—অনন্ত হইতে অনন্তপথে ছুটিতে কবির একি অপূর্ব্ব অভিলাষ।

হে কঠোর জগৎ! হে হৃদয়শূন্য পিপীলিকা প্রাণ মানব! এই প্রকার অসীম কল্পনার ধারনা হৃদয়ে হয় না বলিয়া তুমি হাস্য করিতে হয় কর, বেন্থাম্ অথবা লকের—Aristotle অথবা Molyneux এর শিষ্য হইয়া যদি কবিতার সৌন্দর্য্য দেখিতে না পাও ক্ষতি নাই এই জগতে নিশীথকালে সক্রেটিসের—The Muse makes men divine and from these men thus inspired, others catching the sacred power, form a chain of divine enthusiasts" এই সারগর্ভ গভীর মন্ত্র অকাশবক্ষে চিরকালই প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

আজি বঙ্গে কবিতার আদর নাই—কবি জন্মভূমি বঙ্গে কবিতার আদর নাই, ইহাতে কি প্রাণ আকুল ব্যাকুল হয় না?

রূপ, সনাতন, হৃদয়বান্ কর্ণপূর, উদাসপ্রাণ জয়দেব, সরলহৃদয় চণ্ডীদাস, কবিশিখামণি বিদ্যাপতি যে দেশে কবি, সে দেশে কবিতার এত দুর্দ্দশা? এদেশে কবিতার উপর এত অনাদরের কারণ কি? ইহার উত্তর পরে দিতেছি। আপাততঃ একটা কথা বলিয়া রাখি—সমালোচন অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অনেকে চটিবেন, অনেকে রাগে অন্ধ হইবেন, অনেকে মুখ বাঁকাইয়া উপহাস করিবেন এবং কেহ কেহ বা প্রতিবাদ করিতেও সমুদ্যত হইবেন কিন্তু আমি যাহা বুঝিয়াছি, সরল বিশ্বাসে তাহা বলিতেছি—হৃদয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিব, দয়া করিয়া কেহ কিছু মনে করিবেন না।

আমাদের দেশের সাধারণ লোক, যে প্রকার রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিগণদ্বারা চালিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সুরুচিসম্পন্ন নহেন। দেশের মধ্যে শ্রেণীবিশেষ বা দলবিশেষ, এক একজন শিক্ষিত পণ্ডিতের মতকে আদর্শ করিয়া, সেইরূপ ঠমকে ঠমকে চলিতে শিক্ষা করে। ছোট ছোট গ্র্যাডুএটের দল, তুভিদাস পরিবৃত কতকগুলি ধনবানের পুত্র অথবা গ্রাম্য মোড়ল মহাশয়েরা সময়ে সময়ে হাতনাড়া দিয়া মুখ ঘুরাইয়া যে সকল বক্তৃতা করেন সাধারণে তাই শোনে, তাই শিক্ষা করে এবং তদনুসারে কোন কোন বিষয়ের উপর একটা মত সংস্থাপন করিয়া বসে। একজন চিন্তাশক্তি বিরহিত বি,এ, মেকলে পড়ে, মেকলের খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"Perhaps no person can be a poet or can even enjoy poetry without a certain unsoundness of mind, if any thing which gives so much pleasure ought to be called unsoundness." অমনি সাধারণে বলিল তাইত; সাবধান্ হইতে হইলে কবিতা পড়া কখনই উচিত নহে।

এই সকল উষর ভূমির ন্যায় নীরস হৃদয় মোড়লদিগের জন্যই বর্ত্তমানকালে সাধারণে কবিতার উপর রতি শূন্য।

সহৃদয় প্রবর অক্ষয় সরকার অনেক যত্নে অনেক অনুসন্ধান করিয়া চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির অমৃতময় পদাবলী মুদ্রিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন সত্য বটে কিন্তু কয়জন লোক তাহা আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন? এই জন্যই বলি যে অদ্যাপি আমরা কবিতার গৌরব করিতে শিক্ষা করি নাই।

"প্রভাত উৎসবের" উপসংহার কবি—কল্পনাসখীর হাত ধরিয়া আমাদের নবীনকবি মেঘনাদের ন্যায় অভ্রভেদ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছেন লোকান্তর সংস্পর্শে দেবত্ব পাইয়া স্বর্গের গান গাইতেছেন, সে সময়ে

"কে তুমি মহাজ্ঞানী কে তুমি মহারাজ
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।'

এই পার্থিব ভাবটি স্বর্গীয়ভাবের সহিত কেন মিশাইলেন? বুঝিলাম না। ধনগৌরবী বা কঠোরজ্ঞানী কবির কথায় কোন সময়ে না হাসিয়াছেন? এই স্থলে একটী দৃষ্টান্ত দি—এক সময়ে মলিনক্রস লককে এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—"That all our poets were mere Ballad-makers compared with Si.

Richard Blackmore." উত্তরে লক্‌ লিখিলেন—There is as I with pleasure find, a strange harmony throguhout between your thoughts and mine. উষা শিয়রে দাঁড়াইয়া প্রাণ আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেক্‌ অবিরত মল্লিকার চামর ঢুলাইয়া সুগন্ধে চারিদিক্‌ আমোদিত করুক, তার সঙ্গে মত্ত ধনীর সম্বন্ধ কি? যাক্‌ ও কথা যাক্‌ তারপর উপসংহারকালে—

"ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলিপরে
জেনেছি ভাই ব'লে জগৎ চরাচরে।"

এই দুই চরণ পাঠে কবিকে সুধাইতে ইচ্ছা হয়, যে ঐ দুই চরণ পুস্তকের ঐ স্থলে সংযোজন না করিলে, কাব্যের সৌন্দর্য্য বিশেষ কি নষ্ট হইত? এমন স্বর্গীয়ভাবকে স্বপ্নবৎ করিয়া পার্থিবভাবে কেন পরিণত করিলেন? ছায়াপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আবার ধূলিপরে কেন?

প্রীতি উপহার" উৎসর্গপত্রবিশেষ বলিয়া, প্রথমে তাহার বিষয় আমরা আলোচনা করি নাই, কিন্তু প্রীতি উপহারের স্থানে স্থানে বড় চমৎকার চিত্তদ্রবকারী ভাব সকল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রীতি উপহারের পরেই "আহ্বান সঙ্গীত," এই কবিতার মধ্যে মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে—স্বর্গীয় স্বর লহরী শুনিবার অভিলাষ আছে। একটা প্রধান দোষের উল্লেখ করি—আমাদিগের বিশ্বাস এই যে রবীন্দ্র বাবু কোন বিষয় বিশেষরূপে না জানিয়া লিখিতে অগ্রসর হন না, আহ্বান সঙ্গীতের মধ্যে——

"জোছনা বিভোর চকোরের গান
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান"

এই স্থলে—অবাচকতা দোষ হইয়াছে—যে শব্দ আবহমানকাল হইতে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে সেই শব্দকে বলপূর্ব্বক অন্য অর্থে প্রয়োগ করার নামই অবাচকতা—উপরিউক্ত কবিতার মধ্যে কবি আকাশ অর্থে বিমান শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু আকাশার্থে বিমান শব্দ অবাচক যথা—"ব্যোমযান বিমানোঽস্ত্রী" ইত্যমরঃ। যদি নানার্থবলে কবি বিমান শব্দে আকাশ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন—তাহাও ভ্রম। যথা—"বিমানং ব্যোমযানে চ সার্ব্বভৌম গৃহেঽপিচ। ঘোটকে যানমাত্রেচ পুং নপুংসকয়োর্মতং॥" ইতি মেদিনী। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এ অংশটুকু লিখিবার তত ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল ভাষার ক্ষতি করা হয় বলিয়া এই অংশটুকু লিখিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।

——***——

কাননবালা।

(গার্হস্থ্য কথা।)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামকান্তের উচ্চ অট্টালিকার এক প্রান্তবর্ত্তী একটী কক্ষের ভিতর সেজ জ্বলিতেছিল। শয্যায় বসিয়া——রামকান্ত কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কাগজে নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছিলেন। এক এক খণ্ড লেখা যেমন সমাপ্ত হইতেছিল, অমনি তাহাতে শোষক কাগজের পরিবর্ত্তে সন্নিহিত পাত্রস্থ কিসের গুঁড়া অর্পণ করিতেছিলেন—তৎপরে তাহা ধীরে ঝাড়িয়া স্থানান্তরে রক্ষা করিতেছিলেন।

নিম্নে ভিত্তিকায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া—এক অপূর্ব্ব ললামভূতা ষোড়শী বালিকা এক মনে নিস্পন্দভাবে রামকান্তের কার্য্য দেখিতেছিল। বালিকার বেশ ইদানীং সুসভ্যা রমণীর মত;—গাত্রে গাত্রাবরণ, কর্ণে কর্ণাভরণ; বড় সুন্দর শোভা সম্পাদন করিতেছিল। কপোলে, অংসে, অসম্বদ্ধ অলকাবলী পড়ায় বোধ হইতেছিল, যেন প্রস্ফুটিত নলিনীদলে শৈবালের সংঘাত হইয়াছে! বালিকা সুষমা; পিতা কি জানি কেন ডাকিয়াছেন, তাই বালিকা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পিতার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

একে একে কয়েকখণ্ড কাগজই লিখিত হইল। তখন সুষমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"বুঝিলাম কেন ডাকিয়াছেন,—লিখিলেন ত, এখন মোকদ্দমা হইলেও আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই বুঝিলাম, কিন্তু তাহাতে আমাদের কি সুখ হইবে।"

রাম। "সুখই যেন না হইল, যদি অভিযোগই হয় কালি যে পথের ভিখারী হইতে হইবে।"

সু। "যদি মনের সুখই যায় বড়মানুষী করিয়া কি হইবে!"

রাম। "কেন মনের সুখ যাইবে? যদি যায় যাক্, তা বলিয়া ভিটাটা খোয়াইতে পারিব না।"

সু। "ইহার পরে যদি সব যায়, তবে কি লইয়া থাকিবেন?"

রামকান্ত ঈষৎ তীব্রস্বরে কহিলেন,—

"তাহার ভয় নাই আমি আট ঘাট বাঁধিয়াছি, কিন্তু তোমার কার্য্য তুমি ভুলিও

না, সেই কথা স্মরণ করিয়া দিবার জন্যই আজি আবার তোমায় ডাকিয়াছি।”

বালিকা নতমুখে কাতরকণ্ঠে কহিল,—“বাবা!”

“কিমা—বল।”

“আমাদের যা আছে তাই কেন আমাদের থাক না—আর তাদের যা’আছে তারা কেন এসে তা ভোগ করুক না?”

“তা কখন দেব না। না মা সে কথা মুখেও এন না—দেখি তার কতদূর ক্ষমতা। সেদিনকার ছেলেটা তার আবার স্পর্দ্ধা দেখ। তুমি ছলে হউক, কৌশলে হউক তাহাকে বাড়ীতে আনিতে চেষ্টা করিও। পিতা হইয়া সন্তানকে কেহ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে না—কিন্তু মা। কি করিব আমি উপায় বিহীন, তুমি আমায় এসময় সহায়তা না করিলে আর কে করিবে? তুমি তাহাকে যেরূপ ভাব দেখাইয়া আসিতেছ সেইরূপই দেখাইবে, কালি অবশ্য দেখা করিয়া, বলিবে যেন নিশ্চয় সন্ধ্যার পর এবাটীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করে—তোমার নিগূঢ় কথা আছে তাহাই বলিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতেছ সে কথা বলিও।”

‘আমি মুখে কোন কথা বলিতে পারিব না।’

‘না হয় ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখ।’

‘তা পারিব। কিন্তু বাবা এত করিতেছেন উপরে ধর্ম্ম আছেন, তাঁহার চক্ষে সব টিকিবে?”

‘ধর্ম্ম কি মা! ভীরুরাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে—যাদের বুকে বল আছে—গৃহে অর্থ আছে—অন্নের সংস্থান আছে তাহাদের কাহাকেও কি ধর্ম্মের ভয় করিতে দেখিয়াছ? দুর্ব্বলেই ধর্ম্মের ডাক ডাকিয়া থাকে। কলিকাতায় কত কত বড়মানুষ আছেন যদি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মের একটা অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের এত সুখ সৌভাগ্য কি অদৃষ্টে ঘটিত? মা ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দেও, ধর্ম্ম বলিয়া জগতে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, ধর্ম্ম ভীরুতার একটা অংশমাত্র।’

‘অনেক লোক দেখিয়াছি যখন তাহারা সুস্থ ও সবল ছিল তখন তাহারা কত দুষ্কার্য্যই অবাধে করিয়াছে—ক্রমে পাপাচারে পাপাচারে যখন শরীর ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইল—দুঃসহ রোগগ্রস্থ হইল তখন আবার তাহাদের মতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহারা কখন কিছু মানে নাই তাহারাই আবার তখন অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে।—

রামকান্ত বিরক্তিসহকারে কহিলেন,—“তাহারা ভণ্ড নির্ব্বোধ। জগদ্বিখ্যাত বীর সেকেন্দর সা কত রাজ্য উৎসন্ন দিয়াছিল, কত দেশ মনুষ্য রক্তে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার নাম আজি ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি রহিয়া গেল। সে যদি অনর্থক ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া হৃদয় নির্ব্বলী করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে তাহার এ চিরকীর্ত্তি কোথায় থাকিত? মা! পাপ পুণ্য একটা অলীক কথা। যখন মানুষ হইয়াছি তখন আমরা মনুষ্যজীবন কিসে সুখে অতীত করিতে পারি তাহার পন্থা অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আমাদের বুদ্ধি আছে—জ্ঞান আছে—সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রভাবে আমাদের প্রকৃতসুখ আমরা অনায়াসে খুঁজিয়া লইতে পারিব। আমি

সেই প্রকৃত সুখান্বেষণেই যাইতেছি; এজীবন আজি আছে কাল নাই—যদি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া একদিনের জন্য সুখী হইতে না পারিলাম তবে মনুষ্য জন্ম কিসের জন্য।”

‘সে দিন কথকতায় শুনিয়াছিলাম, মানুষের যদি কিছু প্রকৃতসুখ থাকে তাহা ধর্ম্ম। আরও কত স্থানে শুনিয়াছি ধর্ম্মই জগতের সার।—নিয়ন্তা প্রত্যক্ষ, তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। ভগবান পাপীর দণ্ডের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।’

‘মা! এ অলীককথা তোমায় কে শিখাইল? কে তোমার কোমল হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিল? এ সমুদয় অসত্যকথা বিশ্বাস করিতে নাই।’

‘বাবা! পুরাণেও ত আছে তিনি পাপীকে দণ্ড দেন, পুণ্যাত্মাকে পুরস্কৃত করেন।’

রামকান্ত ঔদাস্যভাবে হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন—‘মা আমার পাগলিনী। ওটা পুরাণ লেখক বা কথকদিগের কল্পনামাত্র। যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা বঞ্চক হইয়া থাকে, কথক আপনার কথকতা বিস্তারের জন্য লোকের মন আকর্ষণের জন্য অনেক মনোরঞ্জনকথা বলিতে পারে, তা বলিয়া তাহাদের সকল কথা বিশ্বাস করা তরলমতির কার্য্য। মা! তুমি বালিকা, বালিকার চিত্ত কোমলতায়পূর্ণ, দুটা মিষ্টকথা শুনিলেই মন দ্রবীভূত হইয়া যায়—চিত্ত তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। তোমাদের ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা উচিত।’

বালিকা শুষ্কমুখে কম্পিতকণ্ঠে, জিজ্ঞাসিল,—

‘বাবা তিনি কি তবে নাই?’

‘থাকিতে পারেন।—তিনি সৃষ্টি করিয়াই নিশ্চিন্ত।—

তিনি আমাদের বুদ্ধি দিয়াছেন, আমরা বুঝিয়া কাজ করিব। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবারই বা দরকার কি কিম্বা মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীতে আসিবারই বা প্রয়োজন কি? এ অতি অজ্ঞতার কথা।’

‘না বাবা। সেদিন ও কথকতায় শুনিয়াছি লোক কর্ম্ম শিক্ষার জন্য একজন পথ প্রদর্শক চাই—কিন্তু প্রকৃত পথ প্রদর্শক তিনি ভিন্ন আর কে আছে—তাই তিনি অনুবরণীয়রূপে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করেন।’

‘বারণ করি মা—আমার কন্যা হইয়া আর এরূপ কুসংস্কার পোষণ করিও না। ধর্ম্ম একান্ত মানিতে হয়—রামমোহন রাজার ধর্ম্ম মান তবু দেবতা মানুষ হইয়া মর্ত্তে আসিয়াছেন—মাটী, কাঠ, পাথরে, দেবতা আছেন এসব আমার সহ্য হইবে না। আমি তোমার পিতা, পিতার অপেক্ষা গুরু আর কেহ নাই—আমি যাহা বলিতেছি তাহাই মন দিয়া শুন।’

‘হ্যাঁ বাবা মাটী, কাঠ, পাথরে কি দেবতা নাই?

‘আবার ঐ কথা! ও কথা ত্যাগ কর ভাল কথা কহ আমি যাহা বলি শুন,—আজি পত্র লিখিয়া রাখ কাল প্রত্যূষেই যাহাতে পত্র তাহার হস্তগত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার পর যাহা করিতে হয় আমি করিব।’

‘কি করিবেন?’

‘তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার একটা প্রশস্ত উপায় দেখিব। সে একবার আমার বাড়ীতে পদক্ষেপ করুক, তার পর দেখিব,

রামকান্তের কে একগাছি কেশ স্পর্শ করে। হতভাগ্য আজিও বুঝে নাই কাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে!—শান্তির আশায় ব্যাঘ্রগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে তাহা সে এখনো জানিতে পারে নাই। রতন ঘোষকে যে উপায়ে পল্লী ত্যাগ করাইয়াছি, ইহারও প্রতি সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে যেমন তাহার তেমনি থাকা উচিত। মা! সুখ কি সেইদিন বুঝিব—যেদিন এ ধনসম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শত্রুর মস্তক চূর্ণ করিতে পারিব।'

'পল্লীর কে শত্রু কে মিত্র কিরূপে বুঝিবেন! কে না আপনার বিরুদ্ধে কথা কহে? অবশ্য দোষ না থাকিলে কেহ কাহারও বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারে না।'

'সমগ্র পল্লীই যদি আমার শত্রু হয়—হউক্, রামকান্ত বালক নহে, শত্রুপীড়নের অসাধারণ ক্ষমতা তাহার আছে। ভয় কাহাকে বলে বাল্যকাল হইতে জানি নাই—শিখি নাই—শত্রু দলনের জন্য সমগ্র পল্লীর উচ্ছেদেও রামকান্ত কুণ্ঠিত নহে।

শুনিয়া সুষমা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না,—পিতার অগোচরে চক্ষের জল ফেলিয়া পরিষ্কারস্বরে কহিল,—'আপনি পিতা, আপনি প্রভু, যাহা বলিবেন, তাহাই করিব—কিন্তু হায় পিতা! পরিণাম ভাবিলেন না!—সে কি ভয়ানক পাতকীর কায একবার ভাবিয়া দেখিলেন না! আপনার কথা পালন করিয়া যথার্থ নিরয়গামিনী হইতে হয়—হইব—কিন্তু হায়! আপনার কার্য্য আপনি একবার ভাবিলেন না? কেমন করিয়া নির্দ্দোষীর হাতে বিষ তুলিয়া দিব? কি অপরাধে তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার সাধ? সে তাহাদের সাহায্য করিবে বলিয়া? পিতা! মিনতি করি, এ কল্পনা ত্যাগ করুন—আপনি মহৎ, সে ক্ষুদ্র, আপনার ক্রোধের সে উপযুক্ত পাত্র নহে। তাহার উপর আপনার ক্ষমতা চালিত হইলে, আপনার ক্ষমতা কলঙ্কিত হইবে—'

রামকান্ত তীব্র ভ্রুকুটি করিলেন,—কহিলেন,

'না—না—আমার এ কল্পনা অপরিত্যাজ্য।'

বালিকা কাতর হইয়া বলিল,—'পিতা—পিতা—ধর্ম্মের দিক চাহ, পিতা। এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে সামান্য অর্থের জন্য আত্মীয়ের বিচ্ছেদ ঘটায়—লোককে অকারণ একরূপ ভীষণ নিগ্রহ করে—স্বদেশ ধ্বংস করিতে যায়—তাহার মতন পাতকী কে আছে পিতা?'

ক্রোধে রামকান্তের নয়ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—কর্কশস্বরে কহিলেন,—তুমি না পার—এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমার মুখ দেখিতে চাহি না—বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাও। পাপীয়সী! এই তোর পিতৃভক্তি! তোর বুদ্ধি—তোর বহুদর্শন আমার অপেক্ষা কিছু অধিক তাই তুই আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিস্। যা—দূর হ—আর তোর মুখ দেখিতে চাহি না!'

পরে অপেক্ষাকৃত কিছু শান্ত হইয়া কহিলেন,—'তুমি আর আমার কেহ নও—আমি আর তোমার কেহ নই—আমার সহিত তোমার যে সম্বন্ধ ছিল, আজি হইতে তাহা ছিন্ন হইয়া গেল।'

এত তিরস্কারেও বালিকার চরণ কাঁপিল না—একগাছি কেশও বিচলিত হইল না—স্থির চক্ষে—ধীরভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

রামকান্ত তীব্রস্বরে আবার কহিলেন,—

'আবার দাঁড়াইয়া রহিলি,—যা—আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।'

সুষমা অগত্যা কক্ষান্তরে যাইতে বাধ্য হইল। রামকান্ত কাগজগুলি যথাস্থানে রক্ষা করিলেন, তখন চিন্তাক্লিষ্টচিত্তে দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন। সে রাত্রিতে রামকান্তের নিদ্রা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুষমা কক্ষান্তরে গেল। সে কক্ষে তাহার ভ্রাতৃজায়া সুধীরা তখন দীপাধারের সম্মুখে বসিয়া কি পুস্তক পড়িতেছিল, প্রবেশকালে সুষমার গতি তাহার উপলব্ধি হইল না, সুষমা নীরবে গিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করিল। তখন সেদিকে সুধীরার দৃষ্টি পড়িল,—একটু হাসিয়া পুস্তক মুড়িয়া বধু কহিলেন,—'একি—তুমি—এখন যে?'

'আসিতে নাই কি?'

'আসিতে আছে,—কিন্তু রাত্রিও অনেক হইয়াছে, এত রাত্রিতে ত কখন আস না—তাই বলিতেছিলাম।'

'বড় গ্রীষ্ম, এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াও চক্ষের পাতা বুজিতে পারি নাই, গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়া আসিয়াছি।'

'তাই বুঝি, মুখখানি এত বিমর্ষ! চক্ষেও জল যে! তবে শুধু গ্রীষ্ম নয়, কি ভাবিতেছিলে? কেন কোন্ কিসের ভাবনা।'

'ভাবিবার কি আছে ভাই!'

'তবে মুখখানি এত মলিন কেন? নয়নে জল কেন? কি হইয়াছে আমায় বলিবে না? পিতা কি তোমায় কিছু বলিয়াছেন?'

'সে আর নূতন কি?

'আজি আবার কি হইল?''—

''যাহইবার সব হইয়াছে,—এতদিন যা করিবার তা' করিয়াছি—এখন যেন আর মন চাহে না! কি না করিয়াছি ভাবিতে গেলে মন অধীর হইয়া পড়ে।'

'কি! আবার সেই ঘৃণিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলেন বুঝি? তিনি পিতা—তুমি কন্যা, পিতা হইয়া কন্যাকে কেমন করিয়া এরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্তি দেন বুঝিতে পারি না। পিতার এইরূপ জঘন্য কার্য্যোদ্ধারের জন্যই বুঝি বিধাতা তোমায় এমন বাল্যে বিধবা করিয়াছেন! তোমাকেও বলি, তুমিই বা কেমন করিয়া তাঁহার কথায় অনুমোদন কর বুঝিতে পারি না। এতবার বলি, তুমি বিধবা হিন্দুরমণী তুমি ব্রহ্মচর্য্য করিবে বিধবার করণীয় ব্রত নিয়ম পালন করিয়া ইহার অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম নারীর আর কি হইতে পারে?—ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা স্বামীস্মৃতিরতা সাধুশীলা বঙ্গ বিধবা রমণী কুলের আদর্শ স্থানীয়া। আর তোমার একি ধর্ম্ম, যে সমুদায় বিষয়ের আন্দোলন বিধবার পক্ষে মহান্ নরক তুল্য, অনন্তকাল নিরয়ে থাকিলেও যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই তাহাই তোমার করণীয় হইয়াছে! পুরাণ পাঠ কেন হয়? পুরাণের আদর্শ চরিত্র সমুদায়, মহোচ্চ উপদেশাবলী লোকে শুনিলে তাহাদের মনের বিকৃতিভাব দূরীকৃত হইয়া,সদ্ভাবে মন পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাহার কি ফল ফলিল! ভাই! বলিতে কি, কেবল তোমার মন সবল করিবার জন্যই এত যত্নে পুরাণ পাঠের আয়োজন

PRINTER'S CERTIFICATE.

I Nirode ch. Mukerjee do hearby certify that the accompanying book was first delivered out of the Press on Thurs...........day of 18th February.......1885.

DURBHUNGA

THE 21st Feb....1885.

Nirode Chunder Mu[illegible]

Printer

STATEMENT

Titl. of the Book.	Pakshek Smalochana
Language.	Bengali
Name of Author.	Contributed by several persons
Subject.	Miscellaneous
Place of Printing.	Durbhunga
Place of Publication.	Do
Name of Printer.	Nirode Chunder Mukerjee
Name of Publisher.	Do
Date of Issue.	18th February /85
Size and Number of Pages.	Royal Octavo Page 32
Number of the Edition	21
Number of Copy.	500
Printed or Litho-Graphed.	Printed
Price.	Has ceased

করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কি উপকার দর্শিল? তোমার চিত্ত সবল হইল কৈ? আবার সেই চিন্তা? আবার সেই বিষয়েরই আন্দোলন?''

সুষমা কেবলমাত্র কহিল,—

'পিতার আদেশ।'

সুধীরা কহিলেন,—'পিতা অন্যায় আদেশ করিলেও যে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? পিতা গুরু, তাঁহার কথা মান্য তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তিনি অন্যায় বলিলেও যে তাহা পালন করিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। তুমি পাপ কর, তোমারই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, তোমার বুদ্ধি আছে,—বিবেক আছে,—অন্যায় জানিলে তাহা তুমি করিবে কেন? পাপ পুণ্যের, কেহ অংশী নাই। তবে পরের জন্য আপনার অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতেছ কেন?'

'পিতার কার্য্য সাধন করিলে—গুরুজনের আজ্ঞাপালন করিলে যদি আমার অকল্যাণ হয় হউক। আপনার অনিষ্টের ভয়ে পিতার কার্য্যে বৈমুখ হইব?'

'সত্য কথা সকল কথা মানি,—পিতার আদেশে পরশুরাম মাতার মস্তক ছেদ করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন জানি,—কিন্তু আমার মনে যেন কেমন খট্‌কা থাকিয়া যায়! আপনার বিবেক কেমন করিয়া পরের কথায় আত্মবলী দিবে! তবে পরশুরামের অবস্থা তোমার অবস্থার সহিত বিশেষ পার্থক্য আছে;—একদিকে এক জনের পূর্ণানিষ্ট, অন্য দিকে আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলী, ইহাতে যে ভাই মনকে প্রবোধ দিবার কিছুই নাই!'

'কিন্তু আর উপায় নাই—আর একটী কথা রাখিতে হইবেই - এই শেষ।'

'পাপও ত্রিপাদপূর্ণ হইয়াছে—আর অধিক বিলম্ব নাই।'

'আর একটী কার্য্য,—পিতার আদেশ, কিরণকে একবার গৃহে আহ্বান করিতে হইবে—তাহা হইলেই তাঁহার শেষ আদেশ পূর্ণ হয়।'

'কেন?—কিরণকে গৃহে আহ্বানের প্রয়োজন?'

'কেন?—সেকি বুঝিতেছ না? ভাই! সে জন্য পিতাকে অনেক বলিলাম, কিছুতেই তাঁহার মতি ফিরিল না, বরং তিরস্কার করিলেন।'

'কি সর্ব্বনাশ! গা শিহরিয়া উঠে! যে বিষয় সম্পত্তির জন্য এত করিতেছেন—এত পাপ স্রোতে সে সব কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাকি একবারও মনে করিতেছেন না? তাহাদের বনবাসী করিয়াও নিশ্চিন্ত নয়, আহা! সেই সরলা বালা তাঁহাদের কি করিয়াছে। পিতৃব্য হইয়া কেমন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবেন? আর কিরণ, সেই বা কি দোষের দোষী! বিনা দোষে তাহাকে কেন ঘোর নিগ্রহে ফেলিবেন! ভগিনী! নিরস্ত হও, পিতার সহায়তা ত্যাগ কর, নির্দ্দোষী দিগের মুখের দিকে চাও! তাহাদের একমাত্র সহায়—কিরণ, সেই কিরণের ধ্বংস হইলেই কি তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়? তাহাদের আর কি আছে ভাই? তাহারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে চাহে না, তাহাদের স্বত্ব ফিরাইয়া দাও, এইমাত্র তাহাদের প্রার্থনা,—এই কি তাহাদের অপরাধ? কন্যাটী বড় হইল,

বিবাহের উপযোগিনী হইয়াছে, তাহাদের অন্বেষণ করিয়া কন্যাকে সৎপাত্রে দান করা পিতৃব্যের উচিৎ, তাহার পরিবর্ত্তে কি এই ব্যবহার? কিরণের দোষ কি। প্রতিবাসীর যাহা কর্ত্তব্য, সে করিতেছে তাহাদের যথার্থ স্বত্বের জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়াছে—সে যাহা করিয়াছে তাহা প্রশংসার্হ। যে চক্ষের উপর এরূপ অত্যাচার দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে, তাহার পুরুষত্ব নাই—সে কাপুরুষ। কিরণের যে পুরুষত্ব মনুষ্যত্ব আছে, পল্লীর আর কাহারও সেরূপ নাই, এ জন্য আমি তাহাকে প্রশংসা করি।'

'আমিও তাহাকে প্রশংসা করি, আর বুঝি,আমাদের এ কার্য্য অতিশয় পাপপূর্ণ—কিন্তু কোন উপায় দেখি না।'

সুধীরার কপোল রক্তিমাভ হইয়া, নয়ন তীব্রজ্যোতি বিকীর্ণ করিল, বলিল—

'তুমি পাপিষ্ঠা, তুমি নির্দ্দয়া—ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয় না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। এখনো উপায় আছে, কিন্তু তাহাতে নিশ্চেষ্ট হইতেছে, যখন উপায় আর থাকিবে না, তখন বুঝিবে যে বিষ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাহার কি বিষময় ফল ফলিয়াছে। এখন তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিয়া রহস্য দেখিতেছ, একদিন ইহার ফল বুঝিবে। আর কথায় কাজ নাই, কিন্তু জানিও,—পরিণামে ধর্ম্ম ও ন্যায়েরই জয় হইয়া থাকে।'

সুরমা মলিন মুখে উঠিয়া গেল।

সুধীরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানি লিপী লিখিতে বসিলেন।

ক্রমশঃ—

বিহারের প্রাচীন ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

যুদ্ধ যাত্রা, মৃগয়া, দেবপূজা ও বিচার কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কারণে রাজা কখন অন্তঃপুর ত্যাগ করিতেন না; কিন্তু তাই বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত যে বীরপুরুষ ছিলেন না, তাহা বলা যাইতে পারে না। তাঁহার চারিলক্ষ সৈন্য ছিল। তাহারা সকলেই কার্য্যদক্ষ ও সচ্চরিত্র। সেনামধ্যে কখন কোন প্রকার অন্যায়াচরণের কথা শুনা যাইত না। সকল সময়েই সৈন্য সংখ্যা সমান থাকিত; কেবল যে সময়ানুসারে সংগৃহীত হইত এমত নহে। রাজকোষ হইতে তাহাদিগকে ভৃতি প্রদত্ত হইত।

রাজদত্ত বৃত্তিভোগী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগকে সামন্ত রাজা বলা হইত। কিন্তু রাজকার্য্যে বা শাসনকার্য্যে তাঁহাদিগের হাত ছিল না। রাজার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা সকল সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রজাগণ রাজাকে একাধিপতি ও একচ্ছত্রী রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া জানিত।

মৃগয়াকালে রাজা বহুসংখ্যক স্ত্রী রক্ষিকা সমবেত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন। এই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে বেষ্টন করিয়া কতকগুলি সড়্‌কীধারী সঙ্গে যাইত। অপর সাধারণকে সম্মুখ হইতে অপসারিত করিবার জন্য অগ্রে দামামা বাজিতে থাকিত, পথিমধ্যে গমনকালে শ্রেণীর উভয় পার্শ্বে লোকে রজ্জু ধরিয়া থাকিত এবং কেহই সেই রজ্জু লঙ্ঘন করিয়া রক্ষিশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত। বনমধ্যে মৃগয়ার সময় রাজা উচ্চ মঞ্চে বসিয়া মৃগয়া করিতেন এবং তাঁহার পার্শ্বে দুই তিনজন চামরধারী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা থাকিত। প্রান্তরে মৃগয়া করিবার সময় রাজা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন এবং রক্ষিগণ অশ্ব বা হস্তিপৃষ্ঠে থাকিত।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সকল লোকেই নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া চলিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে সমাজ বিভক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত মেগাস্থেনিস আরও তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলিয়াছেন।

১। যাহারা শূদ্র বা কৃষিজীবি তাহারা সকলেই রাজার ভৃত্য স্বরূপ কৃষিকার্য্য করিত। রাজাই ভূম্যাধিকারী ছিলেন। ভূমির উপর অপর কাহারও কিছুমাত্র সত্ব ছিল না। কৃষিলব্ধ দ্রব্যজাত সমস্তই রাজার, কৃষকেরা কেবল নির্দ্ধারিত বেতন লইয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া দিত বেতন মুদ্রাকারে প্রদত্ত না হইয়া উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশের দ্বারা প্রদত্ত হইত। অবশিষ্ট শস্য সমস্তই রাজভাণ্ডারে সংগৃহীত হইয়া থাকিত। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্রই শস্য সংগ্রহ করিবার জন্য রাজভাণ্ডার স্থাপিত ছিল। এই সংগৃহীত শস্যের কিয়দংশ ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগকে বিক্রয় করা হইত। কতক অংশে সেনা ও রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রদত্ত হইত। কৃষকেরা উৎপন্ন সামগ্রী সকল গৃহে লইয়া যাইতে পারিত না বটে কিন্তু পরিপোষণের জন্য তাহারা যাহা পাইত তাহাতেই সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত। মেগাস্থেনিস বলেন 'প্রজারা অতি ধীর নিরীহ। তাহারা নগরের সহিত কোন সংস্রব রাখে না। তাহাদিগকে সৈন্যদল ভুক্ত হইতে হয় না সুতরাং তাহারা নিরুদ্বেগে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়। এমন কি যখন দেশের একস্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে তখনও কৃষকেরা নির্ভয়ে নিরাপদে ভূমি কর্ষণ করিতেছে দেখা গিয়াছে।'

২। শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণ বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। প্রায় সকলেই আপন আপন পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিত এবং তাহাদিগের কার্য্যের পরিদর্শনের জন্য রাজকীয় কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত থাকিত। সমস্ত বিক্রেয় দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল এবং শিল্পীদিগকে শুল্কের পরিবর্ত্তে রাজার জন্য বিনামূল্যে বা পারিশ্রমিকে

কর্ম্ম করিয়া দিতে হইত। নৌকা ও শস্ত্র নির্ম্মাতাগণ রাজা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য কর্ম্ম করিতে পাইত না। ভৃতিস্বরূপ কখন তাহারা নগদ বেতন এবং কখন বা খাদ্য সামগ্রী পাইত। চন্দ্রগুপ্তের সময়েও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালেও নগরে যে বিদেশ বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায় যে বণিকগণকে 'মাগধ্য' বলিত। হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, বলীবর্দ্দ প্রভৃতির পৃষ্ঠে পণ্য দ্রব্য সকল নগর হইতে নগরান্তরে লইয়া যাওয়া হইত এবং সমুদ্রপথে লইয়া গিয়া অর্ণবযানে বোঝাই করা হইত। প্রস্তুত বস্ত্র বা বস্ত্র ব্যয়ণের উপকরণ, বিশেষতঃ কাশীর পট্টবস্ত্র, চন্দন কাষ্ঠ, কর্পূর ও কেশর এবং সিন্ধু দেশ জাত ঘোটক এই সমস্ত বাণিজ্যের সামগ্রী ছিল। এতদ্ব্যতীত মণি, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতিরও ব্যবসায় চলিত। তাৎকালিক ধর্ম্মগ্রন্থেও উপদেশ ছিল যে, 'যদি ধনী হইতে চাও তবে সিন্ধুকূলে যাও।' বৌদ্ধসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে শত শত বণিক তৎকালে সমুদ্র গমন করিত। প্রধান প্রধান নগরে বণিকদিগের সমাজ ছিল। প্রধান প্রধান বণিকেরা কখন কখন বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইতেন। প্রধান মহাজনদিগকে নগদ মূল্য দিয়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হইত না এবং কর প্রদান করিলেই তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে রাজকীয় নৌকা ও অর্ণবযানে ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদত্ত হইত।

যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য দূরদেশ হইতে বিক্রয়ার্থ আসিত, ধনী মহাজনদিগকে তাহা একেবারে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইত না। যে সকল সামগ্রী তাঁহাদিগের প্রয়োজন হইত তৎসমস্ত চিহ্নিত করিয়া কিছু বায়না দিলেই চলিত, তৎপরে সুবিধামতে ন্যায্য মূল্য প্রদত্ত হইত। মহাজনদিগের পরিবারস্থ সকল পুরুষেই একত্র মিলিত হইয়া ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত হইত—কেহ সংসারিক ব্যাপারে, কেহ বিক্রয় কার্য্যে এবং কেহ বা ক্রয় বিক্রয়ার্থ বিদেশ গমন করিত। বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে কেহই দারপরিগ্রহ করিত না। ফলতঃ বাণিজ্যের অবস্থা তৎকালে মন্দ ছিল না এবং বণিকগণ অনেকেই সম্পন্ন ছিলেন এবং সহজে প্রচুর অর্থাগমও হইত।

৩। ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে সেনা সংগঠিত হইত। সৈন্য নিয়তই সংগৃহীত থাকিত এবং রাজকোষ হইতে তাহারা বেতন পাইত। যখন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত না থাকিত সেনাগণ তৎকালে আলস্যে ও সুরাপানে কালাতিপাত করিত বটে কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যখন যেখানে যাইতে আদিষ্ট হইত তখনই তথায় যাইত। সেনাগণকে স্বয়ং কোন সমরোপযোগী সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইত না—রাজভাণ্ডার হইতে তাহারা সমস্তই পাইত এবং যুদ্ধাবসানে হয় হস্তী সমস্তই রাজার অশ্বালয়ে ও তোরণে পুনরানীত হইত। প্রত্যেক হস্তী পৃষ্ঠে চারিজন আরোহণকারী থাকিত—একজন চালক ও তিনজন ধানুকী। যুদ্ধকালে রথেরও ব্যবহার ছিল। প্রত্যেক রথে তিনজন করিয়া আরোহী থাকিত—চালক ও দুইজন ধানুকী। এই সকল রথে কেবল যুদ্ধকালেই অশ্ব যোজিত হইত—কুচের সময় ইহা বলীবর্দ্দের দ্বারা টানা

হইত। তাহাতে অশ্বগণের অধিক পরিশ্রম ও বলহানি হইত না। সেনা সংক্রান্ত অপরাপর কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

৪। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শর্ম্মণগণই কেবল পরিগণিত হইতেন। মেগাস্থেনিস্ বলেন যে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় অতি অল্প বটে কিন্তু অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা ইঁহারা অধিক মান্য ছিলেন তাঁহারা কখন কখন যাজন কার্য্য অর্থাৎ পৌরহিত্য করিতেন। রাজা তাঁহাদিগকে অপর কার্য্যেও নিযোগ করিতেন—রাজ্যের উন্নতি বিধায়ক সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত করিতেন, পশুজাতির স্বভাব পরীক্ষায় ব্রতী করিতেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অপরাপর কার্য্যেরও ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পণ করিতেন।

ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগকে লইয়া মহারাজের এক মহা সভা ছিল। প্রতি বৎসর বর্ষারম্ভে নগরের দ্বারদেশে এই সভার অধিবেসন হইত। যে সকল পণ্ডিত কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেন তাঁহারা তাহা লিখিয়া সভা সমক্ষে পাঠ করিতেন। কোন পণ্ডিতের প্রবন্ধ ভ্রমশূন্য হইলে সাধারণের শিক্ষার জন্য তাহা পরিগৃহীত হইত এবং পণ্ডিতকে পুরস্কার স্বরূপ কর হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইত। যাঁহার প্রবন্ধে তিনবার ভ্রম দৃষ্ট হইত তাঁহাকে কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে আর নিযুক্ত করা হইত না। এই সকল তত্ত্ব যে কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমত নহে—বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও পণ্ডিতগণ আপন আপন মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। এই প্রকারে সভা সমিতির দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিস্তার উন্নতি হইত। সভা করিয়া তর্ক বিতর্ক দ্বারা সত্য নির্ণয় করা এখনকার সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ। পূর্ব্ব ভারত সমাজ এ অঙ্গহীন ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি অনভিজ্ঞ ইউরোপীয়েরা পূর্ব্ব ভারতকে অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য ভূভাগ যখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ভারত তখন সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরূঢ়। ইংরাজেরা যখন অনাবৃত নগ্ন থাকিত বা পশুচর্ম্ম পরিধান করিয়া গিরিগুহায় বাস করিত, তাহার অনেক পূর্ব্বে হিন্দুরা সভ্যতার চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

মেগাস্থেনিস বলেন চন্দ্রগুপ্তের সভায় বৌদ্ধ শর্ম্মণদিগের অপেক্ষা হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের আদর অধিক ছিল; কারণ ব্রাহ্মণদিগের পরস্পরের মধ্যে অতি অল্পমাত্রই মতভেদ লক্ষিত হইত। ব্রাহ্মণেরা শৈশবাবস্থা হইতে গুরোপদেশ পাইতেন। তাঁহারা নগরপ্রান্তে উদ্যানমধ্যে আশ্রম সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন এবং মিতাহারী নিরামিষভোজী ও অকৃতদার থাকিতেন। তাঁহারা প্রায়ই দুরূহ বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচারে নিবিষ্ট থাকিতেন এবং যে কেহ তাঁহাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত তাঁহারই সহিত আদরপূর্ব্বক আলাপ করিতেন। কিন্তু যদি কেহ বৃথা বাক্য বা অন্য কোন উপায় দ্বারা তাঁহাদিগের পীড়া বা বিঘ্ন উৎপাদন করিত তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আত্মসংযমে অক্ষম জানিয়া স্থানান্তর করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণেরা ৩৭ বৎসর বয়স হইলে গৃহস্থাশ্রমে গিয়া চিক্কণ বস্ত্র পরিধান অঙ্গুরীয় গ্রহণ ও যত ইচ্ছা দার পরিগ্রহ করিতেন।

ব্রাহ্মণদিগের সহিত গ্রীকদিগের অনেকাংশে মতৈক্য লক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের মতেও জগতের উৎপত্তি ও লয় আছে। তাহারা বলেন পৃথিবী গোলাকার, ইহা সৃষ্টির মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং ইহার গঠনে উদকই প্রধান উপকরণ। তাঁহারা আপ্তহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলেন যে যাহাদিগের স্বভাব অতি উগ্র তাহারাই জলমগ্ন হইয়া বা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করে।

বৌদ্ধ শর্ম্মণদিগের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত মতভেদ ছিল এবং সর্ব্বদা বৃথা বাগ্বিতণ্ডা হইত বলিয়া ব্রাহ্মণাপেক্ষা তাঁহারা অল্প সমাদৃত হইতেন। শ্রেষ্ঠ শর্ম্মণগণ প্রায়ই গিরিগুহায় ও অরণ্যে বাস করিয়া কন্দমূল ও ফলপত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহারা কখনও সুরাপান করিতেন না। বিবাহ তাঁহাদিগের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহারা কখন সভায় আসিতেন না—দূত দ্বারা রাজাকে তাঁহাদিগের মত সংগ্রহ করিতে হইত।

ক্রমশঃ

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য।

নিত্যধাম।

১

কুসুম পল্লব স্তবক শোভিত
ধরণীর পানে যখনি চাই,
ভাবেতে গলিয়া যায় গো পরাণ
শত মুখে তার মহিমা গাই।
অনন্ত বিস্তৃত নীল নীর নিধি—
নয়ন ফিরা'লে তাহার পানে,
প্রেম ভরে ভোর হইয়া তখনি
রত হই তার গুণানুগানে।
কিন্তু যেন পুনঃ শুনিবারে পাই
প্রকাশিছে তা'রা গভীরভাবে —
"সৌন্দর্য্য মোদের চিরস্থায়ী নয়
সময়ের স্রোতে ভাসিয়া যাবে।"

২

বিশ্ব বিভাসক জ্যোতির্ম্ময়-ছবি
যবে গাই রবি-মহিমা গান,
শারদ অম্বরে চারু জোছনায়
বাখানি সুধাংশু—মোহিত প্রাণ;
বলে যেন তা'রা কথায় আমার—
অনন্ত উচ্ছ্বাসে আবেগময়—
"আলোকের ভাতি—সুখের প্রকাশ
আমাদেরো কিছু অনন্ত নয়।"

৩

হে অনন্ত শিল্পী, অজ্ঞেয়, অমেয়,
উপমা রহিত, করুণাময়,
সামান্য এ শিল্প যতেক তোমার
যদি হে এতই মাধুরীময়—
এতই অনন্ত করুণার ভাতি
ঢালিয়াছ যদি মধুর ধারে
বিনশ্বর ক্ষুদ্র ধরণীর কায়,
সদা পাপাচারী মানব' পরে—
কতই মহান্ সে অনন্ত ধাম
হে নাথ, না জানি তোমার হয়,
নরক নির্ম্মুক্ত মানব নিকর
যেখানে তোমার পাশেতে রয়!

Bishop Heber.

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

মহিলা সভার কার্য্যবিবরণ।

(প্রাপ্ত)

আমরা — স্থ 'বঙ্গমহিলা সভা'র একটি 'অসাধারণ' অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী, বাস্তবিক এই খ্যাতির জন্যই আমরাই কেবল সময়ে সময়ে উক্ত সভার কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এমন অবস্থায়, স্থানাভাব থাকিলেও, আমরা বিগত সভার বিবরণ পত্রখানি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সভায় উপস্থিত—

শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী বসু সি, এস—সভাপতি।

,, লবঙ্গলতা ভট্টাচার্য্য এম, ডি—সহ—সভাপতি।

,, স্বর্ণপ্রভা ঘড়ঘড়ি এম, এ।

,, হরিপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী।

,, সন্তোষিণী পাল ন্যায়বাগীশ।

,, মৃণালিনী ঢোল বিদ্যাভূষণ এম, এ।

,, কুসুমকুমারী পাঁড়ে এম, এম, এস।

এতদ্ভিন্ন, আরও অনেকগুলি, এমন কি শতাধিক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন।

উপস্থিত মহিলাবৃন্দের সঘন করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী বসু সি, এস, বলিলেন—

সমাগতা ভগিনিগণ! আমাদের অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয় অতি প্রয়োজনীয়—এতদূর যে তাহার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা এবং উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে বলা যাইতে পারে। সে বিষয়টি কি?—না তরকারি! অর্থাৎ হিন্দুস্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে যে তরকারি খাইবার প্রথা সম্যকরূপে আবহমান কাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত আছে—তাহাই। ভগিনিগণ! তোমাদের অবিদিত নাই—অবিদিত কি, তোমরা প্রাণ সংশয়ের সহিত প্রত্যহই অবগত হইয়া থাক যে এই তরকারি খাইবার প্রথা হইতে আমাদের কি প্রকার সময় নষ্ট হয়, (সভার একস্থান হইতে 'ওঃ! ওঃ!' শব্দ) এবং কি প্রকারেই বা জ্বালাতন হইতে হয়। সহস্র উচ্চদরের কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রন্ধন করাই ত এক ভয়ানক জঘন্য এবং কদর্য্য কর্ম্ম,—তাহার উপর দেশমধ্যে সহস্রাধিক প্রকারের তরকারির প্রচলন থাকাতে (এই সময়ে সভার একস্থান হইতে কাতরস্বরে একজন বলিলেন—(বেশী হবে, বোন্, বেশী হবে!!)—প্রচলন থাকাতে আমাদের প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রথা আমাদের পক্ষে যে কি অমঙ্গলকর এবং কত প্রকারে যে ইহা আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করা আমার অসাধ্য। অদ্য সে কার্য্য আমার মাননীয়া তগ্নী লবঙ্গলতা ভট্টাচার্য্যের উপর ন্যস্ত আছে, ভরসা করি,

---

Extraordinary !

তাঁহার বিশেষ জ্ঞান, বহুদর্শন এবং বক্তৃতা ক্ষমতার দ্বারা তিনি সে বিষয়ে তোমাদিগকে যথেষ্টরূপে অভিজ্ঞ করিবেন। (চতুর্দ্দিকে সঘন করতালি)

তখন সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তা লবঙ্গলতা ভট্টাচার্য্য ডাক্তার মহাশয়া সভামধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়া বলিতে লাগিলেন—

ভগিনী সভাপতি এবং উপস্থিত অন্যান্য ভগিনিগণ! অদ্য তোমরা যে কার্য্য আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছ, তাহা অতি কঠিন—তাহা মৎসদৃশ অক্ষম ব্যক্তির দ্বারা কতদূর সুসম্পন্ন হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তবে তোমাদের আদেশমতে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে আমি কোনক্রমেই অনিচ্ছুক নহি।

বঙ্গদেশে যে নানাপ্রকার তরকারির প্রচলন আছে, সে প্রথা অতি মন্দ। আমি বিলাত এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশ গমন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এই জঘন্য প্রথা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহা আমাদের দেশের একটি অবনতির লক্ষণ; ইহাতে লুক্কায়িতভাবে আমাদের কত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত হইতেছে তাহা পরে ক্রমশঃ বলিতেছি; উপস্থিত কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি যে যতদিন আমরা সকলে মিলিয়া ইহা দেশ হইতে দূরীভূত করিতে না পারিতেছি, ততদিন আমাদের উন্নতির কোন আশাই নাই। (চতুর্দ্দিকে করতালি।) বিলাত প্রভৃতি সভ্যতম দেশে তরিতরকারি খাওয়া অত্যন্ত কম, যাহাও আছে, তাহা চাট্‌নি কিম্বা মোরব্বার মত। সে সমস্ত চাট্‌নি রন্ধন করিবার প্রয়োজন হয় না— বারক্লের সহিত বোতলে করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা তৈয়ারি করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের কোন কষ্টই করিতে হয় না। তৎপরে তথাকার প্রধান খাদ্য রুটি এবং মাংস। তাহাও বিবিধ রকমে বাজারে তৈয়ারি পাওয়া যায়, গৃহবাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে তদ্বিষয়ে কিছুই পরিশ্রম করিতে হয় না। তথায় মৎস্য খাওয়ার যে পদ্ধতি নাই তাহাও নহে, কিন্তু তাহাও স্ত্রীলোকদিগের পাক সাপেক্ষ নহে, আস্ত আস্ত মৎস্য লবণাক্ত করিয়া শুষ্কাবস্থায় বোতলে রক্ষিত থাকে, তাহাকে 'শুঁটকি মাছ' বলে, আহারের সময় গরম জলে ফেলিয়া দিলেই নিমেষমধ্যে প্রস্তুত হইয়া যায়। (শুন, শুন) কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা অবলোকন কর। একেত তরকারির সংখ্যার ইয়ত্তা নাই, এক শাকই পঞ্চাশ রকমে রন্ধিত হইতে পারে, তাহার পর ঝোল এবং ডালনা ভাজা এবং চড়চড়ি যে কত রকমের হয় তাহা কে গণণা করিবে? কিন্তু অতীব আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয় এই যে ইহার একটিও বাজারে তৈয়ারি বিক্রয় হয় না! এ সমস্তই গৃহবাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে রন্ধন করিতে হইবে। কি ভয়ানক প্রথা। কি ভয়ানক সামাজিক অনর্থ। (সভামধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন—দেশ উচ্ছিন্ন যাউক!) আমাদের পুরুষেরা গৌরব করিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ এককালে অতিশয় সভ্য ছিল; ইহাতে পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা ছিল এবং স্ত্রীস্বাধীনতাও ছিল। কিন্তু [illegible] সে কথার এক কপর্দ্দক[illegible] বিশ্বাস করি না। [illegible] বাস্তবিকই পূর্ব্বে [illegible] হইলে কি [illegible] হই[illegible]

...ার লক্ষণ? কখনই নহে। ভারতবর্ষের পুরুষেরা চিরকাল স্বেচ্ছাচারী, চিরকাল তাহারা আমাদিগের উপর পশুবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বোধ হইতেছে ইংরাজী সভ্যতার ফলে আমাদের সে দুর্দ্দিন শেষ হইবে। আমাদের প্রতিষ্ঠিত এই সভাই তাহার প্রধান প্রমাণ। (চতুর্দ্দিকে কর্ণবধিরকারী করতালি)

তরকারির সংখ্যাতিশয্যে যে আমাদের কত প্রকার ভয়ানক সামাজিক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা এক্ষণে বলিতে অগ্রসর হইতেছি। ···মার সময় অত্যন্ত কম এবং আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে আমর ইচ্ছা নাই, সেই··· যত সংক্ষেপে পারি কেবলমাত্র দুই···প্রধান অনিষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াই বক্তৃতা শেষ করিব।

প্রথম, ···নীং আমাদের অল্পবয়স্ক ভগিনীদিগে··· ধ্যে যে হিষ্টিরিয়া রোগের অত্যন্ত প্রাদু··· হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই ···রকারি! কোমল বয়স, কোমল ···শামল প্রাণ, তাহার উপর বাছা··· ঝুড়ি তরকারি রন্ধন ··· কি সহ্য হয়? সুতরাং ···এক বৎসর বাস করিয়াই ···ণ মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হইয়া ···হা! কত বালিকা যে বঙ্গের ···ইরূপ অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ ···কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ···দের সেই শোচনীয় অবস্থা স্মরণ ··· সুবিস্তৃত ভারতভূমে অথবা ···মধ্যে এমন কে সহৃদয়া রমণী ···নি অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে ···মধ্যে একস্থলে দারুণ দীর্ঘশ্বাস ···ত ক্রন্দন শব্দ!)

তৎপরে দ্বিতীয় অনিষ্ট যাহা ঘটিতেছে এবং যাহার বিষয় এখনি আমি উল্লেখ করিব তাহা শ্রবণ করিয়া আপনারা সকলে স্তম্ভিত হইবেন। এই যে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গদেশ ছারখার করিল, এখন আবার ক্রমশঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও আপন পক্ষ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিতেছে তাহার প্রধান কারণ কি আপনারা বিবেচনা করেন? আমি বলি,—আমার ডাক্তারি জ্ঞান হইতে বলি, যে সে কারণ তরকারি,—তরকারি,—একমাত্র তরকারি। (সভামধ্যে অসাধারণ উল্লাসধ্বনি) অনেকে বলেন জমীর আভ্যন্তরিক সর্দ্দির জন্য এই ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে; কথঞ্চিৎ পরিমাণে ইহাও একটা কারণ বলিয়া মান্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু আমার মত এই যে তজ্জন্য যত হউক না হউক, অহরহ ন··· বিধ অপক্ককল মূল শাক সবজী খাওয়াতে শরীরের মধ্যে অত্যন্ত সর্দ্দির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং তাহাতেই প্রধানতঃ জ্বর আনয়ন করে। কি ভয়ানক ব্যাপার, কি লোমহর্ষণীয় কাণ্ড! যে জিনিষ আহার করিয়া এতদূর অনিষ্ট হইতেছে, যাহা বিষবৎ, কি আমাদের দেশের কুপ্রথা, জঘন্য সমাজের জঘন্য আচার ব্যবহা··· যে তাহাই পরম পারিপাট্যের সহিত আমরা প্রত্যহ আহার করিয়া থাকি আবার তাহা রন্ধন করিবার জন্য আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে; মনের মত না হইলে আমাদের পুরুষেরা আবার ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠেন, হয়ত আহার করিতে ···সিয়া সম্মুখস্থ ভাতের থালা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া যান! মরি মরি! যখন কোন দেশের অব

হয়, অধঃপাতের শেষ সীমায় উপস্থিত হয় তখন এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে বটে। অবশ্য স্ত্রীগুলা হিষ্টিরিয়ায় চিররুগ্না হউক, দেশের আবালবৃদ্ধ সমস্ত লোকটা ম্যালেরিয়ায় প্রাণপরিত্যাগ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তরকারি খাওয়া ছাড়িব না। কিন্তু ভগিনিগণ, আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে পুরুষদিগের মুখাপেক্ষা করিলে কখনই তোমরা দেশের এই ভয়ানক অনর্থ দূরীভূত করিতে পারিবে না। তাঁহারা লোলুপ, পেটুক—তরকারি ছাড়ার নাম শুনিলে তাঁহাদের দাঁতকবাটি লাগিয়া যাইবে। (চতুর্দ্দিকে কর্ণ বধিরকারী করতালি)

অবশ্য স্বীকার করি বটে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্যের সুবন্দোবস্তে তরকারীর সংখ্যা হ্রাস হইবার অনে[illegible] সুবিধা হইয়া আসিতেছে। আম[illegible] পুরুষদিগের এখন আর আফিসের চাকরি ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু এমনি সকাল সকাল তাঁহাদিগকে হাজরি দিতে হয় যে এক আলুভাতে ভাত ভিন্ন তাঁহাদিগের অদৃষ্টে আর কিছু হইয়া উঠে না। ইহা অতি সুলক্ষণ এবং যখন দেখা যাইতেছে [illegible]হার জন্য আমাদের পুরুষদিগের [illegible]র কিছুমাত্র কমি নাই, তখন ইহা স্থায়ী হইলেই বড় সুখের বিষয় হয়। [illegible]ন, শুন) কিন্তু ভগিনীগন, এস্থলে আমি একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে সুধু অফিসের ভাতের একরূপ বন্দোবস্ত হইলেই [illegible]য আমাদের বিশেষ উপকার হইবে তাহা [illegible]চ, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে [illegible] কর্ম্ম, যথা অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ [illegible] একেবারে বন্ধ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আর আমাদের সম্পূর্ণ [illegible] ন্য[illegible] কোন উপায় নাই, কেননা, বত [illegible] ভাজ ফলার এই ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষেই [illegible] হইয়া থাকে, এবং এই ভোজেতেই ত[illegible] রকারির ছড়াছড়ি হয়! (সভামধ্যে অজস্র করতালি)

লবঙ্গলতা ভট্টাচার্য্য এম, [illegible]ড, উপবেশন করিলে শ্রীযুক্তা সন্তোষিণী [illegible] ন্যায়বাগীশ উঠিয়া বলিলেন—

ভগিনিগণ। আমার মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা লবঙ্গতা ভট্টাচা[illegible]র্য্য যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া [illegible]বোধ করি কেহই তোমরা তরকারী থা[illegible]র প্রথাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। কিন্তু আমি বলি[illegible] ঘৃণা করিলে চলিবেনা; আমরা দেশের [illegible]নক আচার ব্যবহার অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি এবং তাহা সদাসর্ব্বদা প্রকাশ ক[illegible]ও থাকি। কিন্তু তাহাতে কি কোন ফ[illegible]? আমাদের পুরুষেরা যেরূপ জড়প্র[illegible], নিশ্চেষ্ট, নির্ল্লজ্জ এবং ভীরু, তাহা[illegible] তাঁহাদের দ্বারা কোন সমাজসংস্কা[illegible] করা বৃথা। একটা দৃষ্টান্ত [illegible] মরা স্ত্রীলোকের অবরোধ ও [illegible] করিয়া থাকি; আমাদের [illegible] প্রত্যহ আপনাপন স্বামীকে শতসহস্র গঞ্জনা দিয়া থাকে, [illegible] কি তোমরা বলিতে পার যে অন্ততঃ একজন পুরুষেরও [illegible] তোমরা মন ফিরাইতে সক্ষম (সভা মধ্যে তিন চারি স্থলে শব্দ) কখনই নহে। মন যে কথা, অদ্য এই সভাগৃহে আম[illegible] য়াছি, হয়ত অনেক স্বামী ব্যক্তি আমাদিগের উপর প্রহরী ক[illegible]

ছেন, না হয় এতক্ষণ আমাদের প্রত্যাশায় ঘর বাহির করিতেছেন। (ভয়ানক হাস্যের রোল) অতএব আমি বলি স্বধু ঘৃণা করিলে হইবে না—কার্য্যতঃ কিছু করিতে হইবে। আইস, অদ্য আমরা রীতিমত রেজলিউসন্ পাশ করি এবং যাহাতে সেই রেজলিউসন কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হই। (সভামধ্যে কর্ণবধিরকারী করতালি শব্দ)

শেষে সভাপতি শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী বসু সি, এস, মহাশয়া পুনরুত্থান করিয়া বলিলেন—

আমার মাননীয়া ভগ্নী সন্তোষিণী পাল ন্যায়বাগীশ যাহা বলিলেন তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে আমি অনুমোদন করি। তাঁহার প্রস্তাবনা মত আমি নিম্নকথিত চারিটি রেজলিউশন সভার বিবেচনাধীন করিতেছি। —

প্রথম—যে আমরা—বঙ্গনারী সমাজ—প্রাণের সহিত তরকারি খাওয়ার প্রথা ঘৃণা করি এবং ইচ্ছা করি যে অচিরে ইহা উঠিয়া যাউক।

দ্বিতীয়—যে আমাদের পুরুষদিগের অফিসের ভাতের জন্য একমাত্র আলু ভাতে ভিন্ন আর কিছু তরকারি না হয়।

তৃতীয়—যে আমাদের দেশে যত ক্রিয়া কর্ম্ম ভোজ ফলার হইয়া থাকে তাহা একেবারে বন্ধ হউক। যদি একেবারে না হইতে পারে ক্রমশঃ হউক। আর যাহাও মধ্যে মধ্যে দুই একটা হইবে তাহাতে তরকারির পরিবর্ত্তে চাটনি কিম্বা মোরব্বার ব্যবহার প্রচলিত হউক, আর টাটকা মাছের পরিবর্ত্তে শুঁটকি মাছ ব্যবহৃত হউক।

চতুর্থ—যে উপরোক্ত কয়েকটি রেজলিউসনের নকলের সহিত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বিভাগীয় সেক্রেটরির নিকট অবিলম্বে একখানি আবেদন পত্র প্রদত্ত হউক।

এই রেজলিউশন কয়েকটী পাঠান্তর ...ন করতালির মধ্যে কুপসিকে ধন্য-...দ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।*

চতুর্থ রেজলিউশন মত আবেদন পত্র দেওয়া হইয়াছে কিনা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি নিশ্চয়ই হইবে। তাহার ফল কি হয় তাহা শুনিতে পাইলে যথা সময় পাঠকবর্গকে জানাইব।

স, পা, স।

মাস সমালোচন।

মাঘ।

বৰ্দ্ধমান বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষ বাড়িতেছে, বই কমিতেছে না। এখন বাড়িবারই কথা, যতদিন পর্য্যন্ত আবার ভাদ্রের শস্যাদি না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত লোকের কষ্টের ইয়ত্তা থাকিবে না। বেহারের মতো দুর্ভি-

ভাঙ্গা জেলার কতকাংশের অবস্থা ও বড় শোচনীয়। বাঙ্গালায় তবু দশ জন শিক্ষিত লোক আছে যাহারা গরীবের হইয়া দুইটা কথা বলিতে পারে, জেলার কলেক্টর ডিভিসনাল কমিশনর প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকেও তথায় কতকটা সাধারণ মতের ভয় করিয়া চলিতে হয়, কিন্তু সুদূর বেহার অঞ্চলে শিক্ষিত লোকও নাই, সাধারণ মতও নাই, কমিশনর এবং কলেক্টরই তথাকার হর্ত্তাকর্ত্তা, কিন্তু এই কর্ম্ম চারীরা প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য প্রদান করিতে কতদূর ইচ্ছুক এবং অগ্রগামী তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শুনিতেছি দ্বারভাঙ্গা জেলার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সামান্য টাকাতে যে কি বিশেষ সাহায্য হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাহাতে আবার এই টাকা প্রধানতঃ নীলকর সাহেব দিগের মারফৎ খরচ হইবে, কেননা বেহার অঞ্চলে তাঁহারাই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের প্রধান বিশ্বাসপাত্র। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে এরূপে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গরীব প্রজাদিগের কোন সাহায্যই হইবে না, যদি সুধু লোক দেখানমাত্র অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে কিছু বেশী টাকা মঞ্জুর করুন এবং নিজ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কার্য্য করান।

বর্দ্ধমান বাঁকুড়ার দিকে বরঞ্চ কতকটা প্রকৃত সাহায্য হইয়াছে এবং হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট নিজেও কিছু খরচ করিতেছেন, এবং দেশের মধ্যে চাঁদা উঠাইয়া ও অনেক সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। মধ্যে লেপ্টেন্ট কর্ণেল হেড সাহেব কয়েকখানি সম্বাদপত্রে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা দেখিয়া অতীব সুখী হইলাম, যে তাঁহার প্রার্থনা প্রচারিত হইতে না হইতেই দেশের মধ্যে অনেকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। ষ্টেটস্‌-ম্যান পত্রিকার তরফ হইতে মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় সম্বাদপত্রের মধ্যে বঙ্গবাসী অতি প্রশংসনীয় উদারতা এবং উৎসাহ দেখাইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে বঙ্গবাসী এই দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে অনেক আন্দোলন করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন, এবং তাহার উপর আপনার তরফ হইতে অর্থ সাহায্য করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। আমরা আশা করি এই সাধু দৃষ্টান্ত আমাদের দেশীয় অপরাপর সম্বাদপত্রেরা অনুকরণ করিবেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা লর্ড ডফরিণের বিশেষ কোন কার্য্য দেখিতে পাই নাই যাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে তাঁহার রাজত্বে আমরা সুখী কিম্বা অসুখী হইব। তবে কথা বার্ত্তায় যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহা বেশ আশাপ্রদ। গত মাসে ট্রেডস্‌ডিনারে লাট সাহেব বাহাদুর একটি চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই বক্তৃতায় ভারতশাসনে তাঁহার নীতি কিরূপ হইবে, তিনি তাহার পূর্ণ আভাস দিয়াছেন। যাহা তিনি বলিয়াছেন, তদনুরূপ বাস্তবিকই যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে বোধ করি লর্ড রীপণের গমনের জন্য আমাদের বিশেষ দুঃখ করিতে হইবে না। লাট সাহেব বাহাদুর বলিয়াছেন যে মহারাণী এবং পার্লিয়ামেণ্ট বারম্বার যে উদার নীতির প্রচার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার দ্বারা অবলম্বিত হইবে,

লর্ডরীপণ যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এবং দেশের লোক দিগকে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রসর এবং উন্নত হইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সাহায্য করা ভিন্ন কখন তাহাদের কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না। সাধু বাক্য এবং সাধু সঙ্কল্প। ঈশ্বর করুণ লাট সাহেব বাহাদুরের মতি গতি অবিচলিত থাকুক, এবং আমরা যেন পাঁচ বৎসর পরে পরম সুখে আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতার সহিত লর্ড রীপণের মত তাঁহাকে বিদায় দিতে পারি।

কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এমনি পোড়া যে বড় লাট যদি এরূপ সদয় হইলেন, এদিকে ছোট লাট আমাদের উপর খড়গ হস্ত। ছোট লাট সার রিভার্স টমসন বাহাদুরের সমগ্র বাঙ্গালি জাতির উপরে যে কি বিজাতীয় রাগ জন্মিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিছুতেই আর সে বিষম রাগ মিটিতেছে না। ভয় হইতেছে বাঙ্গালী দিগের "সপুরী একগড়" না করিয়া আর তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন না। যে ডিনারে লাট সাহেব বাহাদুর উপরোক্ত প্রশংসনীয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই ডিনারে ছোট লাট বাহাদুরেরও একটি বক্তৃতা হয়। কিন্তু দুই বক্তৃতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; একটি দেশবাসী দিগের উপর দয়ায় পূর্ণ, অপরটি তাহাদিগের প্রতি রাগ এবং ঘৃণায় পরিপূরীত।

ছোট লাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা এবং অভিলাষের সঙ্গে তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই! কি সর্ব্বনেশে কথা। তবে ত আমরা নাই; তবে ত আমরা যাহা কিছু করিব তাহাতেই তিনি আমাদিগের গতি প্রতিরোধ করিবেন! বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় অতি ক্ষুদ্র বটে—সমগ্রদেশের অধিবাসী সংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা বাস্তবিকই কম, কিন্তু কথা এই যে আজকাল দেশের ভালর জন্য যাহা কিছু হইতেছে তাহা সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই সূচিত এবং অনুষ্ঠিত হইতেছে। অপরাপর লোকেরা অজ্ঞ, অসহায়, অক্ষম, উদাসীন এবং নিশ্চেষ্ট, গবর্ণমেণ্ট দয়া দাক্ষিণ্য করিয়া তাহাদের জন্য যাহা কিছু করিতেছেন তাহা তাহারা সম্ভোগ করিতেছে, আবার নির্দ্দয় হইয়া যাহা কিছু নিগ্রহ করিতেছেন তাহাও মূকভাবে সহ্য করিয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের হইতে উপস্থিতে দেশের কোন ভরসাই নাই, এখন আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা সেই ক্ষুদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই উপর। এমন সময়ে যদি ছোট লাট বাহাদুর সেই সম্প্রদায়ের কার্য্য কলাপ চাল চলন সর্ব্বতোভাবে প্রতিরোধ করেন, তাহা হইলে আমরা যে সর্ব্বস্বাপহৃত হইলাম তাহাতে আর সন্দেহ কি? জানিনা ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

দেশের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় গত মাসে একটি অতি উত্তম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকা বলেন যে আমাদের অবস্থা দিন দিন যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা দেশ মধ্যে একতার অবতারণা করিতে পারিব, ততদিন আর আমরা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইতে পারিব না। তিনি বলেন যে সমস্ত দেশকে একটি প্রশস্ত সামাজিক সমিতি

সূত্রে আবদ্ধ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। সমস্ত বর্দ্ধিষ্ণু সহর এবং পল্লিতে এক একটি রাজনৈতিক সভা হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতেও একটি একটি বড় সভা হওয়া উচিত; এই সভা মফঃস্বলস্থ সমস্ত সভার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদিগকে চালিত করিবে। আবার যতগুলি প্রদেশীয় বৃহৎ সভা হইবে তাহারাও একমত হইয়া কার্য্য করিবে—একমত হইয়া সকল প্রকার বিষয় আলোচনা এবং আন্দোলন করিবে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহা কিছু চেষ্টা করিতে হয় তাহা করিবে। এই প্রস্তাব অতি উত্তম, আমরা বিবেচনা করি ইহার অপেক্ষা আজকালের দিনে আমাদের উন্নতির জন্য অন্য সহজ উপায় আর নাই। দেশের উপকারের জন্য আজকাল অনেক প্রকারের চেষ্টা এবং আন্দোলন আমাদের মধ্যে হইতেছে; কিন্তু কোন প্রকার প্রণালী বদ্ধ নিয়ম নাই বলিয়া সে সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইয়া যাইতেছে, কিন্তু যদি ইণ্ডিয়ান মিররের প্রস্তাব অনুযায়ীক আমরা সমস্ত দেশকে একটি প্রশস্ত এবং সর্ব্ব প্রসারিণী সমিতি দ্বারা বদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টা আন্দোলন এবং উদ্যমই একত্রীভূত হইবে। দেশহিতৈষী মহাশয়দের মধ্যেই এই বিষয়টি উত্তমরূপে বিবেচনা করা উচিত, এবং যাহাতে অচিরে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।

দেশের উপকারের জন্য গত মাসে বোম্বাইতে একটি অতি উত্তম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকার হাইকোর্টের মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত সার ওয়েডারবরণ প্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় বড় বড় ইংরাজ অপর কয়েকজন দেশীয় লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে ভারতবর্ষের সকল প্রকার আবশ্যকীয় সম্বাদ টেলিগ্রাফ দ্বারা যাহাতে বিলাতের কোন বিশিষ্ট সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। বিলাতীয় টাইমসের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা অযথারূপ সম্বাদ প্রেরণ করিয়া আমাদের কিপ্রকার ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন তাহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। সার ওয়েডারবরণ প্রবর্ত্তিত সভা কর্ত্তৃক যদি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যটি ভাল করিয়া সম্পন্ন হয় তাহা হইলে এই অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে—কেন না তাহা হইলে বিলাতের লোকেরা সকল প্রকার ঘটনার "অপর পৃষ্ঠা" অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সার ওয়েডারবরণের এই কার্য্যটী অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ; অন্ততঃ বৎসরে ২০।২৫ হাজার টাকা চাহি। আমরা আশা করি দেশ শুদ্ধ লোক এই কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

গত মাসের মধ্যে ছোটলাট প্রবর্ত্তিত দুইটি প্রধান কমিশন—কলিকাতা মিউনিসিপালটি সম্বন্ধীয় এবং জেলের অত্যাচার সম্বন্ধীয়—এই দুইটিরই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। জেল কমিশনের রিপোর্টের উপর গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য ও গেজেটে বাহির হইয়াছে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সর্ব্ব প্রথমে কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সি জেলে যে সমস্ত অশেষবিধ অত্যাচার আচরিত হইয়া থাকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই পত্রিকার উত্তেজনাতেই প্রধানতঃ উক্ত কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। ষ্টেটস্‌-

ম্যানের অনেক অভিযোগ গবর্ণমেণ্ট অলিক এবং অতিবঞ্জিত বলিযা উড়াইযা দিযাছেন; কিন্তু মোটের উপর অনেক কথা মানিযা ও লইয়াছেন। এই কমিশনের দ্বারা উপস্থিত অপর কোন বিশেষ উপকার না হউক, তবু সাক্ষাৎ সমোপন অনেক জেলর বাহাদুর যে ভবিষ্যতের জন্য একটু সতর্ক হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিশনের রিপোর্টের উপর গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এখনও কোন "কারগুজারি" হয় নাই। কমিশনের রিপোর্ট অবশ্য মিউনিসিপালিটির বিরুদ্ধে। কমিশনেরা মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্যবিভাগীর শাসন যে অত্যন্ত কলুষিত একথা প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, এবং তদ্ভিন্ন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের কি কর্তব্য তাহার একটি প্রশস্ত তালিকাও লিখিয়া দিয়াছেন। মাননীয় কটন সাহেব কিন্তু কমিশনের অন্যান্য সভ্যদিগের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তিনি মিউনিসিপালিটির দোষ স্খালন করিয়া একটি অতি সুদক্ষ পৃথক মন্তব্য লিখিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কি করেন। তাঁহারা হয় কমিশন প্রোক্ত প্রস্তাবগুলি মিউসিপালিটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আজ্ঞা দিবেন, নচেৎ মিউনিসিপালিটির অস্তিত্ব একেবারে ধ্বংশ করিয়া স্বহস্তে সহরের স্বাস্থ্য বিভাগীর কার্য্য সমস্তের ভার গ্রহণ করিবেন। শেষোক্ত প্রকার কার্য্য করিলেই এই মিউনিসিপালিটি ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত যেরূপ অসাধারণ প্রগল্ভতা দেখান হইয়াছে তাহার চরম হয়। ছোটলাট বাহাদুরের আজকাল যেরূপ মেজাজ তাহাতে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

গত মাসের শেষ এবং অতীব লোমহর্ষণীয় ঘটনা—সৌদান ভূমিতে খার্টুম অবরোধে সেনাপতি গর্ডনের মৃত্যু। গর্ডন ঈশ্বরের একটি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি ছিলেন, একজন মনুষ্য এতদূর প্রতিভা সাহস এবং বিক্রমশালী হইতে পারে তাহা বিশ্বাসের অগম্য। সেই গর্ডনের—জগন্মান্য জগৎপূজ্য পৃথিবীর উপর্য্যুক্ত সন্তান সেই গর্ডনের যে এরূপ 'নমাতা ন পিতা, নবন্ধু ন বান্ধব' অবস্থায় সুদূর আফ্রিকার মরুভূমে অসভ্য শত্রু হস্তে—বিশ্বাস ঘাতক নরহন্তার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জিত হইবে ইহা কে জানিত? অদ্য দুই বৎসর হইল নিরপরাধী আরাবী পাশার নিধন সাধন করিয়া—গৃহপ্রাসাদ অট্টালিকা শোভিত আলেকজান্দ্রা নগরীর ধ্বংশ সাধন করিয়া ইংলণ্ডের উদারনৈতিক গ্লাডষ্টোন ইজিপ্ট রঙ্গভূমে যে অভিনব কিন্তু কদর্য্য এবং অমানুষিক অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার শেষ পরিমাণ কি ভয়ানক হইল। গর্ডন অনেক দিন ধরিয়া সৌদানে শান্তি সংস্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণে খার্টুম নগর অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহার সাহায্যের জন্য ইংরাজের সৈন্যদল বিজয়ভেরী বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইতেছিল; বোধ করি আর ৪।৫ দিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইলে তাহারা পঁহুছিযা যাইত। কিন্তু তাহা হইতে পাইল না; দুই তিন দিন পূর্ব্বেই বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা খার্টুম নগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইল। শত্রু প্রবেশের প্রথম উচ্ছ্বাসের গোলযোগেই গর্ডন দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন; তৎপরে কয়েকদিন জীবিত

ছিলেন, গত ৪টা ফেব্রুয়ারি তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

গর্ডনের মৃত্যুতে এবং খার্টুম মাদীর হস্তে নিপতিত হওয়ায় সৌদানে আমাদের ইংরাজগবর্ণমেণ্টের বিপত্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এখন ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া গিয়া বিদ্রোহানল প্লাবিত সমগ্র সৌদানদেশ জয় না করিলে আর নিষ্কৃতি নাই। সে যে কি ভয়ানক কার্য্য—তাহাতে কত অর্থ এবং নরশোণিত অপব্যয়ীত হইবে তাহা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইজিপ্তিয় ব্যাপারে এরূপভাবে সংলগ্ন হইয়া পড়াটা ইংরাজদিগের পক্ষে কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হয় নাই—এখন ঈশ্বর সকল দিক রক্ষা করিলেই মঙ্গল।

রুসিয়ানদিগের সঙ্গেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভাল রকম একটা সাফাই হইতেছে না। এত ধুমধাম করিয়া রুষ রাজত্বের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইল, ইংরাজেরা সেনাপতি লমস্‌ডেন সাহেবের অধীনে এতগুলি লোকজন পাঠাইলেন, গত মাসের মধ্যে যতদূর সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে যে সে সমস্ত লোকজন চুপচাপ করিয়া হেরাতের সন্নিকটে রুসীয়ানদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। ইংরাজেরা অগ্রে গিয়া রুষিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আর রুসীয়ানেরা কোন 'গা গোছ' ও করিতেছেন না এ কথা আমাদের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভাল নহে। অনর্থক এরূপ অযথা অপমান সহ্য করিবার প্রয়োজন কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। রুসীয়ানেরা অগ্রসর হইতেই কৃতসংকল্প—তবে এইরূপ গোলযোগ করিয়া ইংরাজেরা যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারেন। আমরা বিবেচনা করি, ভারতবর্ষের বাহিরে না গিয়া তাঁহারা যদি দেশের ভিতরেই ভালরূপ বন্দবস্থ করেন, একদিকে আপনার সৈন্য সামন্ত ঠিক রাখেন আর অপর দিকে দেশের প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করেন তাহা হইলে ভারত রক্ষার অতি উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হয়। কিন্তু প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইংরাজদিগের বিশেষ কোন চেষ্টাই নাই। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে বিরক্ত করিতেই তাঁহারা বেশী প্রস্তুত। লাট সাহেব যদি দুইটা মিষ্ট কথা বলিলেন, তাঁহার সহকারী ছোট লাটেরা অমনি অন্যদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। এরূপ অযথা নীতির শেষ পরিণাম কি হইবে তাহা ঈশ্বরই বলিতে পারেন।

আমরা কিন্তু মোটের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চতুষ্পার্শ্বীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া নিশ্চিন্ত মন হইতে পারিতেছি না। বোধ হইতেছে যেন চারিদিক হইতে নানারূপ অবস্থা পরম্পরার একরূপ সংঘটন হইয়া আসিতেছে যে যেন অচীরে তাঁহাদের উপর কোন ঘোর বিপত্তি পতীত হইবে। সভ্যজগতের সকল জাতির সঙ্গেই যেন তাঁহাদের সম্প্রীতি ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যাইতেছে। মধ্যে এসিয়ায় রুষ, পূর্ব্ব এসিয়ায় ফরাসী, আফ্রিকায় জর্ম্মণ, যেন সকলেই একে একে তাঁহাদের বিরোধী এবং প্রতিদ্বন্দ্বি হইয়া দাঁড়াইতেছে। আফগানস্থান এবং হেরাত লইয়া ত রুসীয়ান দিগের সঙ্গে লাগিয়াই আছে, আবার চীন এবং ব্রহ্মদেশ লইয়া যে ফরাসী দিগের সঙ্গে একটা কারখানা বাধিবে তাহার খুব সম্ভাবনা বোধ হইতেছে; তাহার উপর ইজিপ্টে এই গোলযোগ। কি করিয়া আমাদের গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বিঘ্নে এত "গ্রহ ফাঁড়া" কাটাইয়া উঠিবেন তাহ আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

PRINTED AND PUBLISHED BY NERODE CHUNDER MOOKERJEE AT THE DURBHUNGA TRADING CO.'S, "UNION PRESS."

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল; ফাল্গুণ, দ্বিতীয় পক্ষ। [২২ সংখ্যা।

সিদ্ধান্তবাগীশের টোল।

(৩) পরমেশ্বর, স্বভাব এবং অদৃষ্ট।

সমস্ত সৃষ্টিই পরমেশ্বরের। 'স্বভাব' আর কেহই নহে, উহা তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় অঘটনঘটনপটীয়সী সৃষ্টিশক্তি, তাঁহারই নাম মায়া বা প্রকৃতি। 'স্বভাবঃ'? অবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতিঃ। ইতি গীতা শাঙ্করভাষ্যে ৫।১৩। অতএব স্বভাব হইতে ভেদজাত সকল উৎপন্ন হওয়া আর ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া একই কথা। 'শক্তিঃ শক্তিমতোর-ভেদঃ' শক্তি আর শক্তিমানে ভেদ নাই। এই ন্যায়ানুসারে ব্রহ্ম হইতে শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্টা নহেন। বিশে-ষতঃ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা আছে যে 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ প্রতিপদ্যতে।' একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানেরদ্বারা সর্ব্বসংসারের জ্ঞানলাভ হয়। এই প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে ভগবান ব্যাসদেব কহিয়াছেন 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ' (শারীরকে) ব্রহ্ম-জগতের নিমিত্ত কারণস্বরূপে অতিমহান এবং উপাদানকারণস্বরূপে স্বীয়তটস্থাশক্তি-রূপিণীপ্রকৃতিই। এই বিচার উপলক্ষে ভারতিতীর্থমুনি বেদান্তাধিকরণমালায় লিখিয়াছেন 'তস্মাদ্ ব্রহ্মোভয়াত্মকম্' ব্রহ্ম উভয়া-ত্মক অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত পুরুষ স্বরূপ এবং প্রকৃতিস্বরূপে জগতের মাতা। এস্থলে পরমেশ্বরকে বৈষম্যদোষের অতীত ও নির্লিপ্ত রাখিবার নিমিত্তে শাস্ত্রে বিচারের পক্ষান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। মহর্ষি ব্যাস (শারীরকে ১।২।৮) কহিয়াছেন 'সম্ভোগ-প্রাপ্তিরিতিচেন্নবৈশেষ্যাৎ।' জীব যেমন কর্ম্মফল ভোগ করেন, পরমেশ্বর সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম করিয়া সেরূপ ফলভোগ করেন না। এই দৃষ্টিতে তাবৎ শাস্ত্র তাঁহাকে অকর্ত্তা বলেন। ভোগজনক যে কর্ম্ম তাহাতেই কর্তৃত্ব। ফলভোগবিহীন কর্ম্মে কর্তৃত্ব কর্তৃত্বই নহে। গীতা (৯ অং) ভগবানের উক্তি আছে 'পিতাহমস্য জগতোমাতাধাতা পিতা-মহঃ' আমি এই জগতের পিতা, মাতা ধাতা এবং পিতামহ। 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং।' আমি ইহার 'প্রভবঃ' অর্থাৎ স্রষ্টা, প্রলয়ঃ অর্থাৎ সংহর্ত্তা, আধার,

লয়স্থান, এবং জগদুৎপত্তি নিমিত্ত অব্যয় বীজস্বরূপ। এই সমস্ত বচনে যেমন পরমেশ্বরের সর্ব্ব কারণত্ব ও কর্তৃত্ব দর্শাইয়াছেন সেইরূপ 'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমংকৃৎস্ন মবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ নচমাং তানিকর্ম্মাণিনিবধ্নন্তি-ধনঞ্জয়। উদাসীন বদাসীনমসক্তংতেষুকর্ম্মসু॥' ইত্যাদিবচনে তাদৃশ কর্তৃত্বের তাৎপর্য্য কহিয়াছেন। ইহার স্বামী সম্মত অর্থের সংক্ষেপ ভাব এই যে 'আমি আপনার অধীন প্রকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টি শক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রলয়কালীন লীন ভূত সকলকে তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে নানারূপে সৃজন করিয়া থাকি। 'কথং প্রকৃতের্ব্বশাৎ প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত তত্তৎস্বভাববশাৎ॥' যদি বল কিরূপে সৃজন কর? তজ্জন্য কহিলেন যে প্রকৃতিবশতঃ সৃজন করি। প্রকৃতি কি? না প্রাচীন কর্ম্মনিষ্পন্নস্বভাব। পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পে যে জীব কর্ম্মাচরণদ্বারা যেরূপ স্বভাব অর্থাৎ অদৃষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিল সেই অদৃষ্টবশতঃ ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেন ইহাই তাৎপর্য্য। উক্ত স্বভাব বা অদৃষ্ট সমষ্টি অভিপ্রায়ে একমাত্র বলিয়া ব্যবহৃত হয় এবং ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে তাহা প্রত্যেক জীবে পৃথক পৃথক। ঈশ্বর সেই সমষ্টি অদৃষ্টের সাক্ষীরূপে উক্ত হন এবং প্রত্যেক জীব স্ব স্ব ব্যষ্টি অদৃষ্টের অধীন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব সৃষ্টি-কালে সমষ্টি অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ও সাক্ষীস্বরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অনুসারে প্রত্যেক ভূত স্ব স্ব অদৃষ্টাধীন প্রকটিত হয়। ন্যায়শাস্ত্র এই অদৃষ্টকে মায়া অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বরের সহকারিণী শক্তি কহিয়াছেন। এখন দ্বিতীয়বচনে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন 'এবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ত স্তবজীববদ্বন্ধঃ কথং নস্যাৎ?' এ প্রকার নানাকর্ম্মের কর্ত্তা যে তুমি তোমাতে জীবের ন্যায় কর্ম্মজন্য বন্ধন কেন হয় না? তাহার উত্তরে কহিলেন 'নচমাংতানি-কর্ম্মাণি' ইত্যাদি। হে ধনঞ্জয়! বিশ্বসৃজনাদিকর্ম্মে আমার আশক্তি নাই অর্থাৎ তাহার ফলভোগ করার ইচ্ছা নাই এজন্য সেই সব কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। অতএব আমি জীবের ন্যায় ফলাকাঙক্ষী না হওয়ায় এক প্রকার উদাসীন। আবার সৃষ্টি করিতেছি তাহাতে উদাসীনও নহি। সুতরাং 'উদাসীনের ন্যায়' অবস্থিতি করি মাত্র। এতাবতা সমস্ত সৃষ্টিই পরমেশ্বরের কৃত, স্বভাব তাহারই শক্তি-মাত্র।

সর্ব্বশাস্ত্রের চরমসিদ্ধান্ত স্বরূপ বেদান্ত প্রকৃতির অতিরিক্ত বাদী। তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়ার দর্শন নহেন। তিনি মুক্তির দর্শন। সৃষ্টিকে মিছা মায়া বলিয়া প্রকৃতির উপরীস্থ পদ প্রদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহার মতে সৃষ্টি মিথ্যা, প্রকৃতি মায়ামাত্র, কেবল ব্রহ্ম সত্য। সে ব্রহ্ম সৃষ্টিক্রিয়ায় লিপ্ত নহেন। তিনি সৃষ্টিতে অনাসক্ত। কেবল তাঁহার আংশিক অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি এই চরাচরকে রচনা করিয়া থাকেন। ইহাই গীতা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই তাৎপর্য্য স্থির-তর রাখিয়া তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলায় দোষ হয় না। কিন্তু প্রকৃতিকে কোন মতেই ঈশ্বর সত্ত্বা হইতে স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে না। তাহা বলিলে তাদৃশ প্রকৃতি অচেতন হইবে, আবার তৎকর্ত্তৃক কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্তে চেতনের কল্পনা করিতে হইবে।

কিন্তু বেদান্তমতে প্রকৃতি পরব্রহ্মের তটস্থাশক্তিমাত্র। তাহার সহিত তাঁহারই অংশবিশেষের ঈশ্বর উপাধি হয় এবং তাহা কালে বিগত হয়। সুতরাং বেদান্ত ঐ প্রকৃতি ও ঐ ঈশ্বর উপাধি উভয়কেই মায়া কহেন। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম। সুতরাং মূলতঃ ব্রহ্মই এই মায়াময় অখিলজগতেরও ব্রহ্মাদি উপাধির কর্ত্তা। কেবল ভোগাভাব জন্য তাঁহার ইচ্ছাও কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করা গিয়া থাকে। নতুবা ভারতীতীর্থমুনি কহিয়াছেন যে 'তাৎপর্য্য বিষয়েতুজগৎস্রষ্টরিব্রহ্মণি নকাপিবিবাদোস্তি।' তাৎপর্য্যতঃ ব্রহ্মেরজগৎস্রষ্টৃত্ব সম্বন্ধে কাহারো বিবাদ হইতে পারে না। 'ঈশ্বর,' 'পরমেশ্বর,' প্রভৃতি যতই উপাধি থাকুক এবং শাস্ত্রকারেরা উপাধি সমস্তকে যতই ভিন্নভাবে দেখুন, ব্রহ্মেতেই সমস্ত নামের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং রক্ষাকর্ত্তা। 'জন্মাদ্যস্যযতঃ' ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে তাহার প্রমাণ আছে। শক্তি সমুদয় তাঁহারই। সেই শক্তি হইতে সর্ব্বভূত যথাযোগ্য শক্তিলাভ করিয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি সেই শক্তির রূপবিশেষমাত্র। বিশেষ বিশেষ শক্তিদীপ ঐশ্বর্য্যধর যত যত ঈশ্বর আছেন পরব্রহ্মপরমেশ্বর সে সমস্ত ঈশ্বরগণের পরমমহেশ্বর। তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি রূপ মহৈশ্বর্য্যভোগে সুরাসুরনর উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

বঙ্গীয় লেখক পাঠক ও সমালোচক।

আজি বড় আনন্দের দিন যে, বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক মহোদয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে! বাঙ্গালীর আজ মহা আনন্দের দিন যে, বঙ্গভাষা তর তর করিয়া উন্নত হইতে যাইতেছে—এক এক লম্ফে দুই চারিটা সোপান অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে! বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা লিখিতেছেন; বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা পড়িতেছেন। বাঙ্গালী ত অবশ্যই বাঙ্গালা লিখিবে, বাঙ্গালা পড়িবে; তবে আর আনন্দ কিসের, তবে আর এত উল্লাস কিসের? ইহার উত্তর আছে। বাঙ্গালাভাষা এখনও পরিপক্ক হয় নাই,—সকল শাস্ত্রের বাঙ্গালা গ্রন্থ নাই, অনেক কথার বাঙ্গালা পরিষ্কার অর্থ নাই, অনেক ভাব বাঙ্গালায় ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না, বাঙ্গালায় লিখিবার ও বলিবার ভাষার এখনও স্পষ্ট সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই,—বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ইহার উপর আবার ইংরাজী

শিক্ষা আরম্ভ হইয়া অনেকের মনে বাঙ্গালা ভাষার উপর অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়াছে। যে ভাষায় সকলই কতক কতক আছে, শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে যে ভাষার গ্রন্থাদি অবশ্য পাঠ্য এবং যাহা রাজভাষা তাহার প্রতি লোকের আস্থা জন্মান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ইংরাজী ভাষা বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জা হইবার জন্য অগ্রসর হইল—সংস্কৃত এক্ষণে মৃতভাষা এবং সংস্কৃত শিক্ষায় এখন আর উদর পূরে না। কিন্তু বাঙ্গালী দেখিলেন, স্বদেশীয় ভাষা ছাড়িয়া বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় লইতে গেলে আপনার সীমার বাহিরে গিয়া পড়িতে হয়। যে ভাষায় নাড়ী কাটা এবং যাহাতে মুখ অগ্নি, তাহা ত্যাগ করা দুষ্কর। যাহা অন্তঃপুরের ভাষা, তাহা ত্যাগ করিয়া জীবন যাপন করা অসম্ভব। যাহা বাঙ্গালীর রক্তমাংস, তাহা ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া থাকা বিডম্বনা মাত্র। এ সকল কথা ক্রমে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিলেন। পরকীয় ভাষার উপর তাঁহার আস্থা কমিল—যাহা আপনার, যাহাতে নাড়ী কাটা, যাহা পুরুষানুক্রমে রক্তমাংসে মিশিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তাই বাঙ্গালায় বেদের ব্যাখ্যা, তাই উপনিষদের বাঙ্গালা অনুবাদ, তাই বাঙ্গালায় ষড় দর্শন, তাই বাঙ্গালায় পুরাণ সংগ্রহ, তাই বাঙ্গালায় তন্ত্রসার। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণ এখন অনেকের পরিচিত, প্রাচীন ঋষিগণের সহিত অনেকের আলাপ হইতেছে এবং বিদেশীয় অনেক পণ্ডিত এখন আর বাঙ্গালীর নিকট গল্পের নায়ক নহেন। বাঙ্গালী এক্ষণে আপনার অভাব বুঝিয়া অভাব বিমোচনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন, বাঙ্গালীর এখন আপন অবয়ব পূর্ণ করিবার জন্য আন্তরিক বাসনা জন্মিয়াছে। অনেক কৃতবিদ্য মহাপুরুষ এখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য, বাঙ্গালাকে একটা ভাষার মধ্যে পরিগণিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এ চিত্র বড় মনোহর। এ উদ্যম বড় প্রশংসনীয়। দিন দিন বাঙ্গালা গ্রন্থের জন্ম হইতেছে, দিন দিন বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের অভ্যুদয় হইতেছে। কোন একখানা ইংরাজী কি বাঙ্গালা সংবাদ বা সাময়িক পত্র হাতে পড়িলেই, তাহাতে বাঙ্গালা গ্রন্থের ও বাঙ্গালা সংবাদ এবং সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই—বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কি সামান্য আনন্দের বিষয়? তাই বলি, বাঙ্গালীর আজ মহা আনন্দের দিন, বাঙ্গালীর বড় গৌরবের দিন। বড় বড় মহারথী সকল রণে নামিয়াছেন, অনেক চেলা তাঁহাদিগের পদাঙ্ক ধরিয়া চলিয়াছেন। প্রকৃতই আমরা আজ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিলাম—দেখিয়া শুনিয়া ভরসা করিতে সাহস হইতেছে যে, শীঘ্রই বাঙ্গালায় যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারিবে। যাঁহার শরীরে এক বিন্দু বাঙ্গালা শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তিনিই বাঙ্গালার এই উন্নতিতে আনন্দিত হইবেন—না হন, জানিব তিনি বাঙ্গালী কুলের কলঙ্ক। কেবল যে বড় বড় তানসেনেরা আসর লইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা অনেককে আসরে নামাইয়াছেন আবার পশ্চাতে অনেকে গলা ভাঁজিতেছেন। বাঙ্গালী এখন প্রকৃতই বাঙ্গালায় পত্র লেখে, বাঙ্গালায় খাতা লেখে, বাঙ্গালায় বক্তৃতা করে। এ চিত্র বড় সুখের তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার ভিতর একটা 'কিন্তু' প্রবেশ করিয়াছে—নিরাশ্রয়

হইবার কয়েকটা কারণ আসিয়া দেখা দিয়াছে। ইহাদিগকে আমরা বড় সুলক্ষণ বলি না। এই কুলক্ষণ গুলি কি এবং কি উপায়ে তাহা নিবারিত হইতে পারে এই প্রস্তাবে আমরা তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। ভরসা করি বাঙ্গালার উন্নতি ও সাধারণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের উপর কেহ বিরক্ত হইবেন না। বক্তব্য কথা কয়টী বলিবার সুবিধার জন্য আমরা প্রস্তাবটীকে বঙ্গীয় লেখক, পাঠক ও সমালোচক এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়া লইলাম।

গল্পে শুনা আছে যে, এক যাত্রার অধিকারী কোন পূজাবাটীতে বায়না লইয়া, 'বাহবা' অভাবে গান জমাইতে পারে নাই বলিয়া গৃহস্থ তাহার প্রাপ্য অর্থ ও বাদ্য যন্ত্রাদি সকল জব্দ করিয়া এবং উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া অধিকারীকে বিদায় করেন। অধিকারী ইহাতেও সে পথ ত্যাগ করে নাই এবং ত্যাগ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে, 'ওস্তাদ্' হইয়া ঘরে বসিয়া থাকা যায় না। আমাদিগের অধিকাংশ বাঙ্গালা লেখক এই 'ওস্তাদ্' দলভুক্ত। অধিকারীর যাত্রা করা যেমন উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে একটা, এই লেখকদিগের লেখা ও তেমনই 'চত্বারিংশ নবাধিক' বায়ুর মধ্যে একটা প্রবল বায়ু—বোধ হয়, না লিখিলে অনেকের ভাত হজম হয় না। পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া পয়সা দেন না, সমালোচক মহাশয়েরা 'বাহবা' দেন না; সুতরাং গান ও জমে না। গৃহস্থ যেমন বাদ্যযন্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া অধিকারীর নিকট হইতে আসরের রোসনাই খরচ আদায় করিয়াছিলেন, ছাপাওয়ালা মহাশয়েরা তেমনই পুস্তক বা পত্রাদি আটক করিয়া লেখকদিগের ছাপার খরচ পত্র আদায় করিয়া থাকেন। তথাপি এই সকল 'ওস্তাদ' দলভুক্ত লেখকগণ, 'ওস্তাদ' বলিয়া, ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না—দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপিয়া তাঁহাদিগকে সপ্ত সিন্ধুর জল পান করাইয়া বেড়ান। বাঙ্গালার ওঝা মহাশয়েরা অনেক ভূত ছাড়াইতে পারেন, কিন্তু দুষ্ট সরস্বতী প্রাপ্ত রোগীর কিছুই করিতে পারেন না—বরং সময়ে সময়ে দুই একটা কামড় খাইয়া পলাইয়া আসেন। বাঙ্গালা ভাষাকে 'বেওয়ারীশ' বা 'দীনা ক্ষীণা' দেখিয়া অনেকে যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা কিছু নিন্দনীয় নহে। এ যাত্রার যে অনেক যাত্রী হইয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই আশাপ্রদ। তবে গান জমে না, কেহ বাহবা দেয় না এবং বায়নার টাকা মিলে না—অধিকন্তু যন্ত্র সকল জব্দ হইয়া যায় এই দুঃখ। পরন্তু অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দুই একটা বাঁশ দেখিলে ডোম মহাশয় তাহার দোষ গুণের বিচার করিতে পারেন, কিন্তু ঝাড়ের ভিতর প্রবেশ করিলেই বংশারণ্যে ডোমান্ধ। কি সর্ব্বনাশ! এত লেখক লইয়া কি করিব? বাঙ্গালার প্রায় সাতকোটী লোকের মধ্যে যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পাঠক যত, লেখক তাহার অনুপাতে অনেক অধিক। গুরুর সংখ্যা অধিক—চেলা বড় একটা দেখিতে পাই না। নেতা যত দেখি, নীত তত দেখিতে পাই না! হরি! হরি! এই কি বাঙ্গালার উন্নতি! ভাইরে! ময়ূরের পালক পরিলেই কি ময়ূর হইতে পারা যায়? সকলেই ময়ূর

হইলে কাক থাকিবে কে? সকলে ময়ূর হইলে ময়ূর দেখিবে কে? ফলতঃ ময়ূরের পালক পরিয়া অনেক কাক মহাশয়, কদাকার দগ্ধ বায়স মহাশয়, আজকাল ময়ূরের দলে মিশিতেছেন, কিন্তু বিচক্ষণ চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছেন না,—তবে সাধারণের কাছে ময়ূর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন সন্দেহ নাই। কেবল ইহাই কেন? অনেক প্রকৃত ময়ূরের পসার কাণা করিয়া দিতেছেন—কোন্‌টা সাঁচা কোন্‌টা ঝুঁটা, সাধারণে তাহা বাছিয়া লইতে পারিতেছেন না, অনেক বিচক্ষণ লোকেও সাধারণের চক্ষে দেখিয়া প্রতারিত হইতেছেন। কিসের লোভে এ পথে এত পথিক হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দেশের এবং ভাষার উন্নতি করিবার ইচ্ছা যদি সাধারণ লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে 'বে-ওয়ারী শ' বাঙ্গালার শবটা লইয়া এত টানা হেঁচ্‌ড়া হইত না। অর্থের লোভে এত লোকে লুব্ধ হইলে জানিব, বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালীকে চিনিতে পারে নাই—বাঙ্গালী মধুপান করিতে পারে, কিন্তু মাছির কামড় সহিতে পারে না। যশের জন্য যে এত লোক ধাবিত হইয়াছে, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? সকলেই যদি যশের প্রার্থী হয়, তবে অর্থী কে?—প্রার্থীগণ গিয়া কার দ্বারে দাঁড়ায়? প্রকৃত কারণ কি, আমরা বুঝিলাম না। আমরা কেবল বুঝিলাম—বাঙ্গালা লেখা এখনকার একটা সংক্রামক পীড়া বিশেষ, বাঙ্গালা লেখকগণ এখন উনপঞ্চাশ বায়ুর কোপে পড়িয়াছেন, দুষ্ট সরস্বতী এখন বঙ্গীয় লেখকগণের ঘাড়ে চাপিয়াছেন।

লিখিবার প্রয়োজন কি?—সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া ও সাধারণ চিন্তাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ চিন্তাকে সৎপথে লইবার উপযুক্ত লোক, কয়জন আছে ভাই? সাধারণকে সৎশিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষা কয়জন পাইয়াছ ভাই? তোমরা সে কার্য্যের এখনও উপযুক্ত হও নাই। অগ্রে নিজে সৎশিক্ষা লাভ কর, পরে অন্যকে শিখাইতে যাইও, নতুবা কাণা মনুষ্য কাণা মনুষ্যকে পথ দেখাইতে গেলে উভয়েই গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে। যাঁহারা সৎশিক্ষা দিবার উপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকের ভিতরেও ভেল ও মেকী আছেন। ভাগ্যক্রমে একটা লেখা কাহারও উত্তরিয়া গিয়াছে বলিয়া, তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই যে অভ্রান্ত হইবে, তাহা অসম্ভব; কিন্তু আমরা এমনই বিচারক্ষম যে, যাহার একটা লেখা উত্তরিয়া গিয়াছে, তাহাকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া গণিয়া লই, আর মহাপুরুষের লাঙ্গুল ক্রমেই ফুলিতে থাকে। আমরা জানি, ক্রমাগত ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে করিতে একটা লক্ষ্যস্থানে লাগিতে পারে, এই ভরসায় অনেকে লিখিয়া থাকেন। একবার লক্ষ্যস্থানে লাগিলেই বাজী মাৎ করিবেন সন্দেহ নাই; কেন না ঝাল খাইয়া যাহাই মুখে দেওয়া যায় তাহাই ঝাল লাগে; কিন্তু লক্ষ্যস্থানে লাগিবে কি না, সেই ভরসায় ইষ্টক নিক্ষেপ করাতে এখন যে পাড়ার লোকের বাঁচা দায় হইয়াছে। ভাল, লেখকেরই না হয় হাতে ব্যথা হইল না, কিন্তু পাড়ার লোক অকারণে ইষ্টক ভক্ষণ করিয়া নাজেহাল হয় কেন?

আমাদিগের শিক্ষার এতই অভাব যে,

আমরা গলাবাজীতে মাৎ স্বীকার করিয়া বসি। যিনি আসরে নামিলেন, তিনি যদি হাত মুখ নাড়িয়া, ভঙ্গী করিয়া, খুব চড়া ধরেন, তাহা হইলেই আমরা বুঝিয়া লই যে, লোকটা দিগ্‌গজ গায়ক। তাঁহার গানে রাগ তাল না থাকিলেও ভূয়সী প্রশংসা পড়িয়া যায়। দোষটা যে কেবল গায়কেরই, তাহা নহে—অনেক স্থলে শ্রোতার গুণেই গান জমিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া ঝুঁটা চালান, তাঁহারা লোক ভাল নহেন। আবার দেখা যায় যে, অনেকস্থলে লেখক নিজেই আপনার ওজন বুঝিতে পারেন না—মহাদেবের বর আছে যে, আপনার স্ত্রী, রন্ধন ও গীত হাজার মন্দ হইলেও আপনার নিকট ভাল লাগিবে। আজ কাল বাঙ্গালা লেখকগণও দেখিতেছি, মহাদেবের বর পাইযাছেন, নতুবা আপনার অসারত্ব বুঝিতে পারেন না কেন? মুদ্রাযন্ত্র যে অনবরত বাবিশ বমন করিতেছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—যদি মহাদেবের বরই না থাকিবে, তবে এত অসার সামগ্রীর জন্ম হইতেছে কেন? আর এমনই মজা হইতেছে যে, অসারের দলে মিশিয়া প্রকৃত সারবান সামগ্রীও সাধারণের কাছে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেছে না এবং তাহার দ্বারা লোকের যে শিক্ষা সম্ভব, তাহাও হইতে পারিতেছে না। তাই আমরা বলি যে, ভাই যে-সে লেখক। তোমরা এখন একটু হাত গুটাও, যাহাদের দ্বারা প্রকৃত কায হইতে পারে, তাহাদিগকে এই বাঙ্গালার উন্নতির সম্বন্ধে একটু কায করিতে দাও। বৃথা গোলে হরিবোল দিয়া ফল নাই,—তাহাতে দেশের অপকার হইতেছে বই উপকার হইতেছে না। যিনি যে বিষয় লিখিবেন, তাহাতে তিনি বিশেষ নিপুণ হইয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত না হইলে যেন শূন্য পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য সে বিষয়ে হাস্তার্পণ না করেন, এইটী আমাদিগের অনুরোধ। আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় যে, যিনি বড় বড় গোটা কযেক পণ্ডিতদিগের নাম করিয়া এবং তাঁহাদিগের কয়েকটা পংক্তি আপনার লেখার ভিতর সাজাইয়া দিয়া পুস্তক বা প্রবন্ধাদি লিখিতে পারেন, তাঁহারই নাম টীটীরমান হইয়া যায়, লোকে মনে করে যে, লেখকটা একজন অসাধারণ পণ্ডিত। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল তাঁহারা বোমা মারিবামাত্রই জানিতে পারেন যে, মালটা সমস্তই ভূষি—সারের নাম গন্ধ তাহাতে নাই। তাই বলি যে, যাহা যথার্থ অসার, তাহার সৃষ্টি কেন?

শ্রীসি——

ক্রমশঃ

——***——

কাননবালা।

(গার্হস্থ্য কথা।)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

'আস মা বনবালা।—আমার কিরণ কোথা?'

তপস্বিনী পূজা করিয়া উঠিয়াছিলেন,—কাননকে দেখিয়া মুখচুম্বন করিলেন। কহিলেন,——

'আমার কিরণ কোথা?'

'এই যে মা। তিনিও আসিতেছেন।'

কিরণও কুটীরে প্রবেশ করিল। কুটীরের একপার্শ্বে পত্রাধারে কতকগুলি ফলমূল ছিল, তপস্বিনী তৎসমুদয় উভয়ের হস্তে দিয়া পানীয় প্রদান করিলেন। কাননও কিরণ উভয়ে তাহা আনন্দসহকারে উদরসাৎ করিলেন। কুটীরবাসিনীর তাহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু আহারীয় ছিল না, সুতরাং তাঁহার আহার করা হইল না। কাননের একখানা ছিন্ন বস্ত্র লইয়া সূচিকার্য্যে বসিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল,—শয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া অজীন পাতিত হইল। একপার্শ্বে মাতা ও কন্যা অপর পার্শ্বে কিরণের শয়নের ব্যবস্থা হইল।

তখন অঙ্গের অশ্রাব্যস্বরে কানন মাতাকে জিজ্ঞাসিল,—

'হাঁ মা। তুমি কিছু খেলে না?'

'আমি আজি কিছু খাব না।'

'কেন মা।'

'সকল দিন কি রাত্রিতে আমি কিছু খাই।'

'যে দিন খাবার কিছু না থাকে, সেই দিন খাওনা,—আর একাদশী, সেদিন ত জলও খাও না—মা। আজ কি তবে কিছু ছিল না?'

'ছিল,—তবে আজ কিছু খাবনা বলেই কিছু রাখিনি।'

বালিকা কাতর হইয়া জিজ্ঞাসিল,—'কেন মা খাবে না?' বুঝি বালিকার চক্ষে জলও আসিল,—মাতা কন্যাকে চিবুক স্পর্শে স্নেহসূচক চুম্বন করিলেন,—কহিলেন—

'মার আমার সকল বিষয়েই কাতরতা, ভয় কি মা!—আমার কোন অসুখ হয় নাই।'

কানন চুপ করিল,—বুঝিল, কেন মাতা আহার করিলেন না, মনে মনে বড় ব্যথিত হইল, কাতর হইল, ভাবিল, 'আহারের পূর্ব্বে কেন একথা ভাবি নাই। আমি এত খাইলাম, আর মার আমার কিছু খাওয়া হইল না।' বালিকা আরও কত কি ভাবিতে লাগিল।

কিরণ তখন ছিন্নবস্ত্রাবদ্ধ কাননের পাঠ্য পুস্তকাদি খুলিয়া দেখিতেছিলেন, হিতোপদেশের স্থানে স্থানে কানন কত কি মন্তব্য লিখিয়াছেন, কিরণ তাহাই দেখিতেছিলেন, আর নিবিষ্ট মনে তাহাই পাঠ করিতেছিলেন। মাতার আহার হইল না, পাছে কিরণ বুঝিতে পারে, এজন্য বালা অধিকতর ব্যস্ত হইল,—তাহা হইলে কিরণ বড় ব্যথিত এবং লজ্জিত হইবে—হয়ত আর আসিবে না।

কানন ধীরে ধীরে কিরণের নিকট গেল, গিয়া বলিল,

'হ্যাঁ ভাই। কি দেখিতেছ?'

কিরণ হাসিয়া কহিলেন,—

'চক্রবাকের মন্ত্রীত্বে তোমার এত রাগ?

'রাগ বুঝিলে কিরূপে?'

'তবে এসব কি লিখিয়াছ?'

কানন একটু হাসিল,—বলিল,—'ইহাত অনেকদিন লিখিয়াছি, এতদিন কি দেখ নাই? রাগ করি নাই, রাগ করিব কেন?—তখন বড় ছেলেমানুষ ছিলাম,—তাই লিখিয়া ছিলাম, চক্রবাকের আবার মন্ত্রীত্ব কি!—মা বলিয়াছিলেন, রাজা রাজ্য শাসন করেন, মন্ত্রী কার্য্যপ্রণালী ও পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন; মন্ত্রী বিচক্ষণ হইবেন, কার্য্যকুশল হইবেন, সুভাবী ও সৎকর্ম্মাম্বিত হইবেন,—তাই লিখিয়া ছিলাম, যে চক্রবাক্ তার আবার মন্ত্রীত্ব কি? আমি ত চক্রবাক্‌কে নির্দ্দেশ করিয়া কিছু বলি নাই।'

কিরণ কাননের কথা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন—

'তুমিও বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতা বটে।'

তখন কুটীর-স্বামিনী সূচিকার্য্য ত্যাগ করিয়া কিরণের নিকট আসিয়া বসিলেন, কহিলেন,—'কি দেখিতেছ?'

'বালার পুস্তকাদি দেখিতেছি।'

'আমার বনবালা কেমন চিত্র করিয়াছে দেখিয়াছ?'

'না—দেখি নাই।'

গৃহস্বামিনী কুটীরের স্থানান্তর হইতে বিবিধ চিত্র আনিয়া কিরণকে দেখাইলেন। দেখিয়া কিরণ বড়ই প্রীত হইল। সমুদ্র-কূলের বিচিত্র সৌন্দর্য্য—অদ্ভুত লীলাময়ী জল তরঙ্গ—সন্ধ্যার অপূর্ব্ব মাধুরী—সমুদ্র গর্ভে সূর্য্যের নিমজ্জন—অভ্যুত্থান বড় সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছিল; নবীন পল্লব—হরিৎ কিশলয়—পুষ্পিত ফলিত তরু-রাজি—শাখায় নানাবর্ণের পক্ষীকুল এমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল, যে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইতে লাগিল।

কিরণ বার বার দেখিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় অদ্ভুত আনন্দে পূর্ণ হইল। কহিলেন,—'বড় সুন্দর হইয়াছে! এবার যখন আসিব—অথবা আপনাদেরই যদি যাওয়া হয়—আবার রঙ্গের বাক্‌স আনাইয়া দিব, এত অল্পকালের মধ্যে কেহ এত উত্তম চিত্র আঁকিতে পারে কখন দেখি নাই—শুনিও নাই।'

কুটীর স্বামিনী গদগদস্বরে কহিলেন,—

'বাবা! তোমার কল্যাণেই আমার

বনবাসী এই বিজনে বসিয়াও জনপদের ভাষা—জনপদের কার্য্যকলাপ শিখিল।'

কি। 'মা। আমি আর কি করিয়াছি—ঈশ্বরের কৃপা থাকিলে, লোকে মরুভূমিতেও পানীয় পায়, নিবিড় বনস্থলীতেও আহার পায়,—অবিশ্বাসী এ কথা বুঝে না,—না বুঝুক, কিন্তু আমরা আপনাদের জীবনে সে কথা প্রত্যক্ষ বুঝিলাম।'

'আমরা পাতকিনী—তথাপি ঈশ্বরের এত করুণা। আজি দ্বাদশ বৎসর বালাকে লইয়া এই বিজনে বাস করিলাম, একদিনও মনে অসুখ নাই, দুশ্চিন্তা নাই,—কত সুখে দিন গিয়াছে। যে দিন হইতে আবার সংসার প্রবেশের চিন্তা আসিয়াছে—সেই দিন হইতে আর তেমন বিমল আনন্দ পাই না। বাছা। আমায় না বলিয়া কেন তুমি এ কাজ করিলে?—স্বীকার করি, তোমার উদ্দেশ্য মন্দ নহে, সরসীর প্রতি তোমার যে নিঃস্বার্থ স্নেহ—সে স্নেহের তুমি উপযুক্ত কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছ। কিন্তু এক জনের উপকার করিতে গিয়া যে অন্যের অনিষ্টের সূত্রপাত হইতেছে! তিনি দেবর,—তিনিও সন্তান তুল্য, যদি তিনি এজন্য বিপদগ্রস্ত হন, তাহা হইলে আমার আর পাপের ইয়ত্তা থাকিবে না। বাছা। সংসারে আমার কোন প্রয়োজনই নাই, সরসী জীবিত থাকুক, তাহা হইলে আমার সব হইল, সরসীকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্যের শেষ হইবে।'

কিরণ কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—

'আমার কার্য্য ন্যায় হইয়েছে বা অন্যায় হইতেছে তাহা তখন বুঝি নাই, আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান যাহা বলিয়াছে, তাহাই করিয়াছি—এখন বুঝিতেছি এ কার্য্যে আপনার হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন, যাহা হইয়াছে তজ্জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল, কিন্তু মা। একটী কথা বলি, অপরাধ লইবেন না, সহিষ্ণুতা পরমধর্ম্ম স্বীকার করি,—কিন্তু অত্যাচারীর দণ্ডের জন্য ও কি অগ্রসর হওয়া উচিত নয়?'

'বাছা। মানুষ কি দণ্ডের কর্ত্তা?'

'মানুষ স্বয়ং না হউক—একটা অবলম্বন বটে, মানুষের দ্বারা যে কাজ হয়, তাই কি মানুষ করে?—মানুষ কে? মা একদিন আপনার কাছেই একথা শুনিয়াছিলাম, আবার আপনাকেই সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইল। পরকাল কেবল শাস্তিময় আবাস বা দণ্ড পুরস্কারের স্থান বলিতে পারি না কিন্তু ইহকালে পাপীর দণ্ড—পুণ্যাত্মার পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। দুষ্কার্য্যের জন্য যে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ড গ্রহণ করে—সে দণ্ডের বিধাতৃ কে? পার্থিব বিচারক, না—অনন্ত মহীয়ান ঈশ্বর? আপনার অনিষ্টের দিকে যে দৃক্‌পাৎ না করে সে মহৎ—কিন্তু পরের অনিষ্ট দেখিয়া যে নীরবে থাকে, সে কাপুরুষ—এ সহিষ্ণুতা অবশ্য প্রশংসার যোগ্য বলিতে পারি না। প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের বিপদোদ্ধার করা মনুষ্যের একটী প্রধানতম কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্য পালন মানসেই অগ্রসর হইয়াছি। এজন্য আপনার মনে ক্লেশ দিব জানিলে বোধ হয় আমি পশ্চাৎপদ হইতাম,—কিন্তু আর একটী কথা বলি,—আপনার জন্য আপনি

যদি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে আপনাকে লোকে স্বার্থপর বলিতেও পারিত, ভগবানের নিকটও বোধ হয় অপরাধী হইতে হইত,—কিন্তু প্রতিবাসীর একার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যেমন কর্ত্তব্য, আপনি মাতা, আপনারও সন্তানের প্রতি সেইরূপ—কি তদপেক্ষাও কর্ত্তব্যতা আছে। সংসার আপনার পরিত্যাজ্য হইতে পারে, সংসারের বিষয় বিভবকে আপনি তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু কাননের মুখেরদিকে চাহিলে আপনি সে চিন্তা করিতে পারেন না,—আপনি ত্যাগ করিবেন বলিয়া আপনার কন্যা তাহাতে বঞ্চিত হয় কেন? কাননের পিতার যে অতুল সম্পত্তি ছিল,—সে সম্পত্তি থাকিতে—আজি সে পথের ভিখারী কেন?—কটু কষায় ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে কেন? আপনি এতদিন যে সে জন্য কোনরূপ চিন্তা করেন নাই, এজন্য আপনার অন্তঃকরণকে খুব মহৎ বলিতে পারি,—কিন্তু একথাও মুক্তকণ্ঠে বলিব—আপনি তাহাতে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইয়াছেন।'

কাননের মাতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন,—

'যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন কি কর্ত্তব্য তাহাত ভাবিয়া পাই না। না—আর ভাবিয়া কি করিব,—ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে। অভিযোগ দিটাইতে চেষ্টা করিও—একান্ত না হয়, দেবরের যাহাতে অনিষ্ট না ঘটে, তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্ট রাখিও। আর এক চিন্তা, পাছে সরসীর জন্য তুমি বিপদগ্রস্ত হও। দেবর এজন্য যদি তোমার উপর রুষ্ট হন—তবে যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তা আর বলিতে পারি না! বাছা! অভাগিনীর মুখেরদিকে চাহে এমন জগতে কেহ নাই, তোমাদের গুণ একমুখে বলিতে পারি না, তোমাদেরই কল্যাণে সরসী মানুষ হইয়াছে,—আজ বুঝি তাহারই উপকার করিতে আসিয়া তোমার অমঙ্গল হয়! বাছা! ক্ষান্ত হও, যা' হইবার হইবে, সরসীর অদৃষ্টে সুখ থাকে, আমার কোন চেষ্টাই করিতে হইবে না, আর যদি সরসীর ভাগ্যে ক্লেশই থাকে, আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাকে সুখী করিতে পারিব না। তবে বৃথা এ চেষ্টা কেন?'

কিরণের মুখ ম্লান হইল, মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় বিচঞ্চল হইয়া উঠিল,—ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীর অকম্পিতস্বরে কহিলেন,—'আমরা ন্যায়ের সহিত কর্ত্তব্য পথে ধাবিত হইব—তাহাতে দোষ কি মা।'

'দোষ নাই বুঝিলাম, কিন্তু ভগবানের কর্তৃত্বের উপর মানুষে কিছু করিতে পারিবে কি।'

'না পারুক্, কিন্তু কর্ত্তব্য বিষয়ে চেষ্টায় কি কিছু ক্ষতি আছে?'

'আছে,—যে জানে ভগবান করিলে হইবে, না করিলে হইবে না, সে যাহা করে, তাঁহার ইচ্ছা মাত্র সম্পন্ন হয়, তখন সে জানিয়াও আপন ইচ্ছানুযায়ী কায করিতে যাইবে কেন? যদি সরসীর অদৃষ্টে সুখই থাকিবে, তাহা হইলে আমি পথের ভিখারিণী হইব কেন? আর এক কথা, বাছা! ভিখারিণী হইলেই কি সুখী হয় না, ভিখারিণীর মত মনের সুখ কার আছে? সংসারী সংসারকেই সুখের মনে করে, কিন্তু যাহারা প্রকৃত সুখের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, তাহারা সংসারকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে; আমরা সংসারী—সংসারকেই অমূল্য জ্ঞান করিতেছি।'

'তবে বালার অরণ্যবাসই শ্রেয়ঃ,—এই কি স্থির করিযাছেন ?'

'আমি স্থির করিবার কেহ নই, বালার স্থান কোথায—গিনি ঠিক করিবার তিনি করিয়াছেন। বিবাদ বিসম্বাদে মনের সুখ যায, সুখ কিচুমাত্র বৃদ্ধি হয না।'

'বুঝিলাম, আপনার সংসারে প্রয়োজন নাই, কিন্তু সরসীও কি চিরদিন অনূঢা থাকিবে ?'

মাতা হাসিয়া কহিলেন,—'থাকিবে কি না জানি না, সরসীর বিবাহের প্রয়োজন হয়, এই বনে বসিযাই বর মিলিবে।'

'ভাল—মাতা যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহার কি হইল ?'

'বলিও—অভিযোগ মিটিযা যাক্—আমি যাইব বই কি ? এতকাল গুরুদেব প্রবাসে ছিলেন, এখন তিনি দেশে আসিয়াছেন, এখন তাঁহার আদেশ অনুযায়ীই কার্য্য করিব। তিনি এপর্য্যন্ত আমায় কোন আদেশ করেন নাই। তিনি একবার মাত্র বলিযাছিলেন, 'আমার কোন অনুরোধ আছে, সময়মতে বলিব,' তাঁহার অনুরোধ আমি আবার সংসারী হই,—তাহা পূর্ব্বে বুঝিযাছিলাম, কিন্তু তাঁহার আদেশ কি সম্পূর্ণ না শুনিলে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না।'

'অচলানন্দ স্বামীই কি আপনার গুরুদেব ?'

'হ্যাঁ—তিনি এতকাল তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছিলেন, বর্ষ কাল হইল দেশে আসিয়াছেন।'

'আমিও তাঁহার নিকট বিশেষ পরিচিত আছি, আমি ইংরাজী অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিযা এখন তাঁহার নিকট ন্যায় ও দর্শনাদি অল্প অল্প শিক্ষা করিতেছি। তিনি সাহিত্য শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন—সাহিত্য ও তাঁহার নিকট কিছু কিছু পডিতেছি।'

আনন্দে অর্পণাদেবীর নয়নে বারী বিন্দু বহিল—কহিলেন,—

'বাবা! বড সুখী হইলাম, সাধুমন নহিলে কি এমন সাধুসঙ্গ ঘটে। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন,—ভাল! আসিবার সময় কি তিনি কিছু বলিয়া দিয়াছেন ?'

'কিছু না। আমি এখানে আসিতেছি, তাহাত তাঁহাকে বলি নাই। তিনি অনেক সময আপনাদের নাম করেন বটে। আমিই তাঁহাকে আপনাদের সম্বন্ধে সব কথা বলিয়াছিলাম—তিনি শুনিযা বড কাতর হইলেন,—তখনই আমি বুঝিযাছিলাম, তিনি আপনাদের স্নেহ করেন,—কিন্তু স্নেহের কারণ বুঝিতাম না।'

'তিনি যে আমার দুঃখ ব'লে কাতর হয়েছেন, তা নয়। তাঁহার স্বভাবই এই। তাঁর কি আছে,—তথাপি পরের জন্য এত কে করিতে পারে ?'

'মা! তিনিত এ অভিযোগে অসন্তুষ্ট নন,—আমি যে কাজ করি, তাঁহাকে বলিয়া করি, তিনি শুনিয়া এইমাত্র কহিলেন,—'ভগবান দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিবেন।'

অর্পণাদেবী অন্যমনা হইলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনাআপনি বলিলেন,—'তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক!'

কিরণ কহিলেন, 'আপনার বিশ্বাস অনন্ত আপনিই এ জগতে ধন্যা। আপনার চিত্তের ভাব এরূপ জানিলে আমি কদাপি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু যাহা হই-

য়াছে, তাহা আর নিবারণের উপায় নাই,—এখন কি হইবে ?'

'যাহা হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই হইয়াছে, কিন্তু আর তুমি তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিও না—আর যদি মিটিয়া যায় যাক্, সরসী বাঁচিয়া থাক্, ইহা ভিন্ন আমার অন্য কামনা নাই।'

সরসী বসিয়া বসিয়া ঢুলিয়া মাটীতে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। ক্রমে জ্যোৎস্নাটুকু ডুবিয়া গেল,—একটু অন্ধকারে খদ্যোতের একটু জ্যোতি বাড়িল, দুই একটী পাখী বৃক্ষ কোটরে বসিয়া দুই একবার ডাকিয়া উঠিল—দুই একটা কাক জাগিয়া উঠিল,—একটা—দুইটা—তিনটা ক্রমে সকলেই জাগিল,—সব পাখী জাগিল, সকলেই সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল, একটু পূর্ব্বে ডাকের একতান ছিল না—বড় বেসুরা লাগিতেছিল, জ্যোৎস্নারাত্রে পাখী বেসুরা গায় বলিয়া কুটীরস্বামিনী সময়টা তত বড় অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন একতানে কাননের যাবতীয় পাখীর কলধ্বনি তাঁহার কাণে গেল, তাড়াতাড়ি তখন সরসীর দিকে তাঁহার মন আকর্ষিত হইল,—ভোর হইল, বুঝি সরসী এখনো জাগিয়া বসিয়া আছে ?—হায়। সরসী যে মাটীতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া নাসিকা মৃৎলগ্ন করিয়া ঘুমাইতেছে। অপর্ণাদেবী শশব্যস্তে বালাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, বলিলেন,—আহা। বাছা আমার মাটীতে পড়িয়াই ঘুমাইতেছে, আমি এমনই হতভাগী—আপনার কথাতেই আপনি উন্মত্ত হইয়া আছি !'

কিরণও এ দৃশ্যে ব্যথিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন।

ক্রমে ঊষার রক্তিমচ্ছটা প্রকাশ পাইল। গগনের কৃষ্ণছায়া ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল। খদ্যোতরাশি কোথায় লুকাইয়া পড়িল, লতা, পাতা, বৃক্ষপল্লব বায়ুর মন্দান্দোলনে নাচিয়া নাচিয়া নূতন দিনের নূতন হাসি হাসিতে লাগিল—কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত হইল।—কুটীরস্বামিনী কাননকে ধীরে অজীনে শয়ন করাইয়া প্রাতঃস্নানে বহির্গত হইলেন।

কিরণের চক্ষে নিদ্রা ছিল না, শয়ানা বালার একপার্শ্বে বসিয়া সেই অসংবৃত গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ প্রভাত বাতভরে ধীরে ধীরে দুলিতেছিল—তাহাই দেখিতে ছিলেন। বালার কোমল সুপ্রশান্ত হিমানিসিক্ত ফুল্ল নলিনীবৎ আনন্দিত মুখমণ্ডল—রক্তাভ স্ফুরিত অধরোষ্ঠদ্বয়—তাহার ভিতর আরও কত কি—কত কি ভাবে কত কি চিন্তায় দেখিতেছিলেন,—আর সে সুদৃশ্য দেখিয়া মনে মনে কল্পনায় কত কি বিচিত্র ছবি আঁকিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন,—

বালা এত গাছ পালা, লতা, পাতা, আকাশ, পাতাল, বেলাভূমি সাগর তরঙ্গ আঁকে—যাহা সুন্দর দেখে তাহাই আঁকে—আহা। যদি বালা আপনার অমৃতময় মুখখানি দেখিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ হইত। বালা সৌন্দর্য্যের পাগল, সুন্দর জিনিষ খুজিয়া বেড়ায়, আপনার নিকট এত অপরিমেয় সৌন্দর্য্য আছে, তাহা সে জানে না। হায়। জগতই এইরূপ! আপনার বিষয় কেহই জানে না, পরের বিষয় লইয়া জীবন কাটায়!'

ক্রমশঃ

ভ্রান্তমন—বুঝেও বুঝে না!

—***—

(১)
উধাও গগন' পরে
জ্যোৎস্নার গঙ্গা ধরে
উঠিবারে চায় মন—উন্মত্ত বাসনা।
অই যে চাঁদের পাশে
অনন্ত তারাটি ভাসে
গলায় পরিবে ওরে—একি বিড়ম্বনা?
ভ্রান্ত মন—বুঝেও বুঝেনা!

(২)
নিতি নিতি এই সাধ
একি ঘোর পরমাদ
অশান্ত মনের আশা কিছুতে মিটেনা।
বিরলে প্রাণের দায়
উপদেশ ছলে হায়
কত বলি—ভস্মে ঘৃত—ভুলেও ভোলেনা।
কথা মোর—শুনিতে চাহেনা।

(৩)
অই অনন্ত আকাশে—
নীরব যামিনী কোলে
নীরবে তারাটি দোলে
বক্ষঃ ছাড়ি—মন চায়—উড়িতে ত্বরায়।
স্বর্গমর্ত্ত্য—জ্ঞান নাই
দুঃখে প্রাণ কাঁদে তাই
সোহাগে বাসনা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়
পরিণাম—ভাবেনাক হায়।

(৪)
হাসে পূর্ণ শশধর——
খুলিয়া প্রাণের দ্বার
তীব্র স্রোতে প্রাণ আমার
ভেসে যায়—যেতে চায়—চুমিতে তাহারে;
আবার করিয়া বল
চেপে রাখি বক্ষস্থল
নীরবে তখন মন কাঁদে হাহাকারে
আমি কাঁদি—চাহিয়া তাহারে॥

(৫)
স্তব্ধ নিশীথ হৃদয়ে—
মধুর পাপিয়া ডাকে
মন মোর—থাকে থাকে
প্রাণের উচ্ছ্বাস তোলে—হৃদয় পূরিয়া;
দুই স্বর যায় মিলে
রজনী হাসিয়া ফেলে
প্রতিধ্বনি উপহাসে—দুরাশা দেখিয়া—
তবু গায়—প্রমত্ত হইয়া॥

(৬)
কভু নবীন উল্লাসে—
হৃদয় উছলি' হাসে
কখন বিষাদে ভাসে
সৃষ্টিছাড়া একি রোগ হইল মরমে?
অবাধ্য—শুনেনা কথা
কি জানি কি তার ব্যথা?
নিজে কাঁদে—নিজে হাসে বলেনা সরমে—
আপনিই—মরে সে মরমে॥—

(৭)

নিশা মেঘাবৃত হ'লে—
ত্রিভুবন শূন্য দেখে
কি যেন খুঁজিতে থাকে
উদাস নয়নে বয়—চাহিয়া উপরে,
নিবে যায় হাঁসি খুসি
ফুরায় প্রমোদ রাশি
হৃদয় ডুবিয়া যায় ঘন অন্ধকারে,
প্রতি কক্ষ—উথলে আঁধারে॥

(৮)

চায় অসীম গগনে—
কত মেঘ আসে যায়
এই যায়—এই যায়
কোথা চাঁদ—কই তারা—ভাসে নিরাশায়,
যামিনী—চাহিয়ে যায়
প্রভাত—তথাপি চায়
থাকে থাকে—তবু দেখে—যদি দেখা পায়
আশা শেষে—হাসিয়া পলায়॥

(৯)

সেই কাল রজনীতে—
চাহিয়া চাহিয়া শেষে
নয়ন মুদিয়া আসে
নিস্তেজ হৃদয় যন্ত্র ঘুমাইতে চায়—
আঁধার ধরণী বক্ষে
আঁধার হৃদয় কক্ষে
আমিও—আঁধার স্রোতে—ভাসি শেষে হায়
কাল নিশা—এই ভাবে যায়॥

(১০)

কিন্তু জগতের খেলা—
রজনী প্রভাত হ'ল
দুঃখে সুখে দিন গেল
নীরবে যামিনী পুনঃ ব্যাপিল ভুবন,
ফুটিল আঁধার রাশি
ফুটিল চন্দ্রমা হাসি •
মেদিনী মাখিল সুখে সুধাংশু কিরণ
দেখা দিল—তারা অগনন;

(১১)

হায় নির্লজ্জ মানস—
জ্যোৎস্নার গলা ধরে
উধাও গগন' পরে
আবার উঠিবে—সেই উন্মত্ত বাসনা—
সেই যে চাঁদের পাশে
মলিন তারাটি ভাসে
গলায় পরিবে তারে—ঘোর বিড়ম্বনা!
ভ্রান্তমন—বুঝেও বুঝে না॥

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জগৎরাম রায়ের রামায়ণ।

ভরত সম্বাদ।

স্নেহ করি দেব হরি কন ভরতেরে,
না কাঁদ না কাঁদ ভাই মোর দিব্য তোরে।
রোদন করিতে তোর বদন শুকাল,
বল দেখি হেন দশা কে তোর করিল।
বনবাস ক্লেশ আমি সব সহ্য করি,
তোর মুখ দেখে বুক যায় যে বিদরি।
আভরণ হীন, কেন পরেছ বাকল?
এ চাঁচর চুলে কেন জটার মণ্ডল?
এখনও জীবিত আমি প্রাণে নাহি মরি,
এতেক অবস্থা তোর দেখিতে না পারি॥
আমার অযোধ্যা বুঝি কোন রাজা নিল?
অথবা তোমারে কেহ কটু বাক্য কৈল?
বল বল সকল কি বটে বৃত্তান্ত,
তার প্রতিকার আমি করিব নিতান্ত।
যত দিন বনে আমি করিনু গমন,
সেদিনে মাতুল ধামে ছিলা দুইজন।
তোর সনে মোর দেখা তখন না হল,
এজন্য আমার হৃদে শেল বেজেছিল।
এ চন্দ্র বদন আজি দরশন কৈল,
সব দুঃখ দূরে গেল নেত্র ধন্য হলো।
চক্ষু তারা হারা হয়ে ছিনু ওরে ভাই,
ভরত সমান ভাই খুঁজে পেতে নাই।
এই ব'লে কুতুহলে ভাই লয়ে বুকে,
লক্ষ লক্ষ চুম্ব খান ভরতের মুখে।
হেন অবসরে মাতৃগণ বেগে যায়,
তৃষ্ণাযুত গাভী যেন জল দেখি ধায়।
রাঘবে বেষ্টিত সবে তখন করিয়া,
আরে পুত্র রাম আছ মোসবে ছাড়িয়া।
নয়ন থাকিতে মোরা অন্ধমত হৈল,
শ্রবণ থাকিতে বিধি বধির করিল।
ভোজন শয়ন নিদ্রা আইল তোর সনে,
এই দেখ বিধবা হয়েছি মাতৃগণে।
তুমি জগতের প্রাণ যবে হৈলে রাম,
জীয়ন্তেতে মরা মোরা হৈনু পুত্র রাম।
মাতৃগণে বিধবা দেখিয়া নারায়ণ,
বশিষ্ঠে প্রণমি প্রভু জিজ্ঞাসিয়া কন।
পিতার কুশল জিজ্ঞাসিলেন শ্রীহরি,
বশিষ্ঠ বলেন বাক্য অতি ধীরি ধীরি।
রাজীবলোচন যবে ত্যজি আইলা বন,
তব শোকে শোকান্বিত হইল রাজন।
হা রাম! হা রাম! রাম বলিয়া বদনে
দশরথ মহারাজ ত্যজিল জীবনে।
মুনির এ বাণী শুনি যেন কর্ণ শূল,
মায়া করি দয়াময় হইলা আকুল।
রোদন করেন রাম জানকী লক্ষ্মণে;
মাতৃগণ মন্ত্রিগণ আত্ম বন্ধুগণে।
এককালে ব্যাকুল রোদন করে বনে,
মহা কোলাহল উপস্থিত সেইক্ষণে।
বশিষ্ঠ সান্ত্বনা কৈল প্রবোধ কথায়,
পরে সবে স্নান কৈলা যাইয়া গঙ্গায়।
পিতৃগণে তর্পণ করিলা ভগবান,
ইত্যাদিক ফল পিণ্ড করিলা নির্ম্মাণ।
মোর উপহার এই বন ফলমূল,
এই পিণ্ড লহ পিতা হয়ে অনুকূল।

পিণ্ডদান করি উপবাসে সেই দিনে,
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহিলা সর্ব্বজনে।
জগত জন্মের জ্বালা হতে বিমোচন,
অদ্ভুত পুরাণ রটে ভাবি নারায়ণ।
শ্রীরাম সম্মুখে ভরত কাঁদি বলে,
নয়ন খঞ্জন ভাসে লোচন সলিলে।
নারায়ণ শুনহে সকল মন দিয়া,
শোকার্ণবে ভরতে ভাসালে কি লাগিয়া ?
দোষ কৈল মায়ে সেই দোষে দোষ মোরে,
এদাসে ত্যজহ বল কি বিধি তোমারে ?
পতিত পাবন, ভুবনে খ্যাত,
তবে ভবে কি ভরত বঞ্চিত ?
তারিয়া পাষাণ, সুযশ থুলে,
পশু পাখি আদি, অভয় দিলে,
মিত্রতা করিলে, চণ্ডাল সনে,
এসব দেখিনু, নিজ নয়নে,
এ সকলে কৈলে নিজে করুণা,
এ দাসে করুণা, কে কৈল মানা ?
বল বল বল, দয়াল নিধি,
কি দোষে কৈলে, মোরে কোপ হৃদি ?
অশেষ অপ-চয় যদি করি,
তবুত জানিহে আছেন শ্রীহরি।
জনক জননী জানি না কভু।
গতি মতি সব তুমি হে প্রভু।
নিজে পক্ষাপক্ষ, ভাবিলে মনে,
দাস তবে যাবে কাহার স্থানে ?
জননী সমান সদৃশ সব,
পিতা অন্যথা হৈলা মনে ভাব।
মোসবারে কার করে সঁপিয়া,
কাননে আইলে, নিদয় হইয়া ?
এ অনাথে হৃদি না দ্রবে কেনে ?
কবে হিয়াটী বেঁধেছ পাষাণে ?
মোর দোষাদোষ, এমতি বটে,
তোমারে নিদয়, কথাটি ঘটে।
মো সম অধম কে আছে আর ?
কল্পতরু সেবিয়া দুঃখই কার ?
কলঙ্ক সাগরে ডুবিনু আমি,
ত্রাণ কর হের ভুবনস্বামী।
জটাজুট কৈলে চাঁচর কেশে,
বাকল বসন সাজে এ বেশে ?
বনফল মূল এ মুখে খাবে,
এ তাপে পাপ ভরত কি জীবে ?
চল ঘন শ্যাম ঘরে ঘুরিয়া,
চরিতার্থ কর চক্ষে চাহিয়া।
পাটে রাজা হয়ে প্রজারে পাল,
নতুবা অযোধ্যা পুরী ডুবিল।
তব শত দাসের দাস যে আমি,
অযোধ্যার রাজা বিরাজ তুমি।
এ বলি লোটি, ভরত পড়িল,
দ্বিজ জগতরামে রচনা কৈল।
উঠ ভাই ভরত ভাবনা কর দূর,
তোর প্রতি মোর মতি না হয় নিঠুর।
পশু পাখি দেখি মোর দ্রবি যায় হিয়া,
তোমা হেন ভাই মোর ত্যজি কি করিয়া।
ভক্ত অগ্রগণ্য ধন্য তুমি প্রাণ তুল্য,
তোর প্রতিনিধি বিধি কভু না করিল।
তোর প্রেমে মোর তনু মন বশীভূত,
নিশ্চয় জানিহ নহি বাক্য বহির্ভূত।
কিন্তু এক চিন্তা ভাই পাই মনে মনে,
সত্যে পার হৈতে পিতা পাঠাইল বনে,
পুত্র হয়ে পিতৃ বাক্য পালন না করি,
ভানুকুলে কালে কালে কলঙ্কিনী করি।
ছত্র দণ্ড রাজখণ্ড পিতা তোরে দিলে,
জটাধারী করে মোরে কাননে পাঠালে।
একথা অন্যথা করি পুত্র হয়ে যদি,
কি করি ভরতরে তরিব ভব নদী ?
পিতা সত্য পাশে বদ্ধ না হইলে মুক্ত,
আমি তুমি মাঝে ভাই হব পাপযুক্ত।

... আপনে জন্ম হইল আমার,
... ধর্ম্ম নষ্টে কষ্ট পাইবে সংসার।
... দিকে ধর্ম্ম নষ্ট আর দিকে প্রেম,
... চিন্তহ ভাই যাতে হয় ক্ষেম।
... অতি বুদ্ধিমান বিধানে পণ্ডিত,
... রক্ষা যাথে বলহ উচিত।
... বলেন শুন শরণ তারণ,
... বক্ষিতে বল এ সব বচন।
... সাক্ষাতে কভু বলিতে নাজানি,
... তে দাঁড়াতে নাবি চিতে ভয় মানি।
... মন্ত্রণা ভাব দেহ দেব হরি?
... যেন জ্ঞান তেন নিবেদন করি।
... বাক্য লঙ্ঘন সে বটে অনুচিত,
... টেতে বর দিলা এ কোন বিহিত?
... হইয়া পিতা কামিনীর বশে,
... কর্ম্ম করিল ইথে ধর্ম্ম নষ্ট কিসে?
প্রভু কন ও ভরত ভাল না বলিলে,
... স্ত্রীয়ের বশ পিতাকে নিন্দিলে।
... দেবাসুরে বর স্থাপিত আছিল,
... যাচিয়ে সেই স্থাপ্য বর নিল,
... পুত্র দুই ত্যাগ কৈল সত্য হেতু,
দশরথ পিতা হন অতি ধর্ম্ম সেতু।
যুগে যুগে যশ যার জগতে বিখ্যাত,
কত ভাগ্যে মিলেছিল ধর্ম্মরূপ তাত॥
হেন জনে দোষ দেয় সে অতি বেল্লিক,
ভাব ভাই পিতা হন পরম ধার্ম্মিক।

পুন কন ভরত স্তবিত উপদেশ,
সত্যে পার হবে কিসে বলি সবিশেষ।
অযোধ্যা রাজ্যেতে রাজা নিজে হও তুমি,
তোমার বদলে বনে বাস করি আমি।
অথবা লক্ষ্মণ রাজা হ'ন গিয়া পাটে,
চরণ সেবিব আমি থাকিয়া নিকটে।
আমার বচন যদি লঙ্ঘন করিবে,
চরণ নিকটে মোর মরণ হইবে।
প্রভু কন ভরতরে শুন প্রাণ ভাই,
জনকের কথা সে অন্যথা হবে নাই।
বনবাসে দিলা মোরে তোরে দিলা রাজ্য,
ব্যত্যয় না কর ভাই মনে ধর ধৈর্য্য।
এ ভারতী শুনিয়া ভরত ভাবে মনে,
অবশ্য বুঝিনু প্রভু না যাবে সদনে।
তবে কেন কি কারণ ছার প্রাণ রাখি,
এত বলি অবনীতে বসি অধোমুখে,
নব দূর্ব্বাদল ছবি ভাবিয়া অন্তরে,
প্রাণ ত্যাগ জন্য বসে প্রভু বরাবরে।
ভরত করেন প্রাণ ত্যাগ অনুবন্ধ,
হেনকালে বশিষ্টেরে কন রামচন্দ্র।
মোহে ইষ্টদেব নিষ্ঠ ভাই ত্যজে প্রাণ,
একান্তে সান্ত্বনা কর যাহে জন্মে জ্ঞান।
বিষয় বুঝিয়ে গুরু নিভৃতে ডাকিয়া,
ভরতে বলেন কিছু শুন মন দিয়া।
দ্বিজ জগতরাম অনুপম কাব্য গায়,
জানকী জীবন হে তরাবে ভব দায়।

ক্রমশঃ

ভারতে দুর্ভিক্ষ।

আমরা পূর্ব্বে * লিখিয়াছি যে সতত দুর্ভিক্ষ প্রবলতাই আমাদের আসল ব্যাধি, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের কষ্টে আমরা দেশশুদ্ধ লোক সর্ব্বদাই হাহাকার করিতেছি। আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পদে পদে আমাদের সুখ সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখিতে পান, বক্তৃতায়, ভ্রমণবৃত্তান্তে, পুস্তকে, সম্বাদ এবং সাময়িক পত্রে—সর্ব্বত্রই তাঁহারা এই কথাই প্রচার করেন যে তাঁহাদের রাজত্বে ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজাবর্গের সুখ এবং সমৃদ্ধির সীমা পরিসীমা নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা—সেই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজাবর্গ—আমরা সে সুখ সমৃদ্ধির কোথাও কোন বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাই না। বাস্তবিক যাহা নাই, তাহা আর দেখিব কি করিয়া? ইংরাজ যাহা বলিবার বলুন, তিনি এখন যাহা বলেন তাহাই শোভা পায়, কিন্তু আমাদের প্রাণান্ত হইল; আমাদের আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই।

আমাদের এই মহাব্যাধি—দুর্ভিক্ষ প্রবলতা—কোথা হইতে আসিল? ইহা কি আমাদের বরাবর ছিল? হাজার হাজার বৎসর হিন্দুরা রাজত্ব করিয়াছে, প্রায় সহস্র বৎসর মুসলমানেরাও আধিপত্য করিয়াছে, আর ইংরাজের রাজত্বও শতাব্দির [illegible] হইয়া গেল। এই সমস্ত কালটাই কি আমরা 'হা অন্ন যো অন্ন' করিয়া আসিতেছি? আমরা বলি তাহা নহে, হিন্দু কিম্বা মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের এ কষ্ট ছিল না। কেবল ইংরাজের রাজত্ব হইতেই ইহা আরম্ভ হইয়াছে, আর এখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, ইহার পর, যতদিন যাইবে, ইহা আরও বর্দ্ধিত হইবে।

যে ইংরাজের রাজত্বে এই কষ্ট হইতেছে তাহার প্রধান কারণ এই যে সে রাজত্ব বৈদেশীক। মুসলমানের রাজত্বও ত বৈদেশীক ছিল, তবে তাহাতে কেন কষ্ট হয় নাই? তাহার কারণ এই যে মুসলমানেরা বিজয়কালে যদিও বিদেশীয় হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয় অবসানে আমাদের স্বদেশীয় হইয়া গিয়াছিলেন। আরব, পারস্য, তুরস্ক, কিম্বা তাতার কোন বিশেষ দেশকে তাঁহারা স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন না, ভারতবর্ষকেই জন্মভূমি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফল এরূপ হইয়াছিল যে যদিও তাঁহাদের রাজত্ব আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভূষণে ভূষিত ছিল না, তাহাতে অনেক প্রকার গুণের সঙ্গে অনেক প্রকার দোষেরও অভাব ছিল না, তথাপি তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন, আইন কানুন,

* ২০ সংখ্যার ৬৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

বিচার শাসন যাহা কিছু প্রবর্ত্তিত করিতেন, সে সমস্তের মূলে একটা নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মম স্বার্থপরতা কার্য্য করিতে পাইত না। কিন্তু ইংরাজের রাজত্বে এই ভয়ানক দোষটি সর্ব্বতোভাবেই বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা বিদেশীয়, তাঁহারা দেশ জয় করিলেন, এত কাল তাহাতে রাজত্বও করিলেন, কিন্তু এখনও ইহার উপর তাহাদের একটা মায়া জন্মে না। স্বদেশের এবং স্বজাতীর উন্নতি ও উপকারের জন্যই তাঁহারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, সেই উন্নতি এবং উপকারের সম্ভবনা যতদিন উপস্থিত থাকিবে, ততদিন তাঁহাদেরও ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে; তৎপরে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন,—যাইতে তাঁহারা কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিবেন না। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরাজের সম্বন্ধ ঠিক এইরূপ, কিন্তু বল দেখি, যেখানে এরূপ নির্লিপ্ত সম্বন্ধ সেখানে কি কোন প্রকার আত্মীয়তা কিম্বা মমতার সম্ভাবনা আছে? কখনই নহে। সুতরাং ইংরাজের রাজত্ব মুসলমানের অপেক্ষা সহস্রগুণে সভ্য হইলেও, সহস্র প্রকার প্রশংসনীয় গুণে ভূষিত হইলেও, তাহার শেষ ফল ভাল হয় নাই। ইংরাজের জন্য ভাল হয় নাই, তাহা নহে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ হইযাছে এবং এখনও হইতেছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে—দেশবাসীদিগের পক্ষে তাহা হইতে বড় অমঙ্গল ঘটিযাছে। সে অমঙ্গল কি? প্রধান এই যে আমরা অনাহারে—অন্নবস্ত্রের অভাবে—প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি!

রাজাই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই রক্ষক, তিনিই প্রতিপালক; তিনি সমগ্র প্রজাবর্গের সমষ্টিস্বরূপ, প্রজাকে ছাড়িয়া তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব নাই; প্রজার ভাল হইলেই তাঁহার ভাল হয়, প্রজার মন্দ হইলেই তাঁহার মন্দ হওয়া উচিত। কিন্তু এ সমস্ত অকাট্য সত্য ভারতবর্ষীয ইংরাজ রাজত্বে সর্ব্বতোভাবে প্রযুয্য নহে। ইংরাজ রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহার স্বার্থে প্রজাদিগের স্বার্থহানি হয। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, ইংরাজ আমাদিগের রাজা হইলেও আমাদিগের হইতে পৃথক। তিনি আপনার দিকে টানেন, তিনি রাজা, বলবান, ক্ষমতাশালী, তাঁহার অভিপ্রায সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণান্ত হয, আমরা দুর্ব্বল, আমাদের কষ্টের ইযত্তা থাকে না। এরূপ বিপর্য্যয অবস্থায, রাজায় প্রজায় এরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধে যে দেশের মধ্যে অহরহ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিবে—অনাহারে প্রত্যহ সংস্র সহস্র প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি!

ইংরাজ রাজত্বের যে কথাটাই আমরা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করি, তাহাতেই এই অসংলগ্ন অস্বাভাবিক সম্বন্ধ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। রাজ্যশাসন রাজার প্রধান কর্ম্ম, শান্তিরক্ষা, বিচার, বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, কর সংগ্রহ, শিক্ষাদান, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি এসমস্তই শাসন কার্য্যের অন্তর্গত। এক এক করিয়া বিচার কর, দেখিবে কি চমৎকার অভাবনীয় অনাসৃষ্ট প্রথায় ইংরাজ এসমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন।

দেশ শাসন হইবে ভারতবর্ষ; কিন্তু তজ্জন্য ইংলণ্ড হইতে সহস্র সহস্র মুদ্রা বেতন দিয়া লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারী আনীত হইবে! যে দেশের শাসন হইবে, সেখান-

কার লোকেরা কোথাকার কেহ নহে, তাহারা মূর্খ, বোকা, অসভ্য, তাহারা আপনার অবস্থা বুঝে কি? সুতরাং ইংলণ্ড হইতে অজস্র লোক আসিতেছে; তাহারা রাজস্বের সমুদয় কার্য্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, এবং আমাদের রক্ত শোষণ করিয়া যে অর্থরাশী সংগৃহীত হইতেছে তাহা হইতেই তাহাদের উদর পূরণ হইতেছে! ইহাতে যে কত অপব্যয় হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কিন্তু টাকাটা সেব আমাদিগকেই দিতে হইবে, তাহাতে আমরা মরি আর বাঁচি। ৫০০ পাঁচ শত টাকা বেতন দিলে একজন দেশী জেলার মাজিষ্ট্রেট অতি সহজে পাওয়া যায়, আর কিছু বেশী দিলে কমিশনর পাওয়া যায়; আরওকিছু বেশী দিলে লেপ্টেনান্ট গবর্ণরও পাওয়া যায়, কিন্তু এই পাঁচশত টাকার স্থানে ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে ৫লক্ষ টাকার ব্যয়ভার সহ্য করিতে হইতেছে। ইহাতে আর আমরা গরীব হইব না, সর্ব্বস্বান্ত হইব না, দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাইব না?

ইংরাজ বলেন, দেশী ভাল লোক পাওয়া যায় না। দেশী লোক মূর্খ, দেশী লোক অসৎ, দেশী লোক অক্ষম, দেশী লোক বল বীর্য্য হীন। ঠিক কথা! দেশী লোক অপদার্থ, না ইংরাজের 'ইমান' কলুষিত? হিন্দুরাজত্ব কাল ছাড়িয়া দেও, মুসলমানদিগের সময় এই দেশী লোকেরাই রাজস্বের সমস্ত কার্য্য করিত। গ্রাম্য প্রহরী হইতে সেনার সেনাপতি পর্য্যন্ত, রাজস্ব আদায়ের সামান্ত প্যাটওয়ারি হইতে রাজস্ব মন্ত্রী পর্য্যন্ত, সমস্তই দেশী লোকেরাই হইত। তাহাদের রাজা কি কার্য্য চলিত না, না রাজা তাহাদিগকে মূর্খ এবং অক্ষম বলিয়া ঘৃণা করিতেন? ইংরাজ বলিবেন যে সে অসভ্য রাজত্ব ছিল, তাহার কার্য্যকলাপ চালান যে সে লোকের দ্বারাতেই হইত। ঠিক কথা! উপস্থিত বাঙ্গালার প্রজা জমীদার আইনই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। শতাধিক বৎসর হইল ইংরাজ দেশের রাজস্ব আদায় করিতেছেন, তাহা করিবার জন্য কেবলমাত্র বেতনে কত লক্ষ—কত কোটী টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে একটু সুনিশ্চিত সত্যাক্তিপূর্ণ নীতির বিবরণ হইল না। ক্রমান্বয়ে কয়েকজন ছোটলাট, কয়েকজন রাজস্বমন্ত্রী আর তাঁহাদের সঙ্গে কত গণ্ডা সেক্রেটরি শতাধিক বৎসর মস্তক ঘামাইলেন, তার পর বলিতেছেন কি না যে দেশের প্রজাবর্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সম্যকরূপে অবগত নহেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে দেশী লোকের পরামর্শ এবং সাহায্য লইয়া যদি ইংরাজ চলিতেন তাহা হইলে কখনই তাঁহাদিগকে এরূপ অজ্ঞ অবস্থায় থাকিতে হইত না। আকবর বাদসাহের সময় বিখ্যাত হিন্দুমন্ত্রী টোদর মল্ল একাকী সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন; সেই বন্দোবস্তের মূলসূত্র ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত গর্ব্বিত দাম্ভিক ইংরাজদিগকে চলিতে হইতেছে; যে যে স্থানে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে সেইখানেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই বন্দোবস্তই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। এমন অবস্থায়, এরূপ জলন্ত সত্যের সম্মুখীন হইয়া কি প্রকারে আমরা বলিব যে দেশী লোক সক্ষম নহে?

সেনা বিভাগেও এই রূপ। মুসলমান দিগের সময় সেনামধ্যে প্রায় সমস্ত প্রধান বড়ই হিন্দুরা করিতেন। রাজা মানসিংহ, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ, আরও কত মহা মহোপাধ্যায় ইহার প্রমাণ। ভারতবর্ষের লোক যুদ্ধ করিতে পারিত না, কিম্বা যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিতে পারিত না এ কথা কি সত্য? শত সহস্র বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরাজ সে কথা বিশ্বাস করেন না, সুতরাং তিনি বিলাত হইতে সেনা এবং সেনাপতি সমস্তই লইয়া আসেন। কিন্তু তাহার ফল এই হয়, যে যেখানে এক টাকা খরচ করিলে আমাদের বাধা নির্বাহ হইয়া যাইত তথায় আমাদিগকে সহস্র মুদ্রা খরচ করিতে হয়। সে টাকা আসে কোথা হইতে? ভারতবর্ষের প্রজাদিগের শোণিত হইতে। অতএব অহরহ এই প্রক্রিয়ার অধীন হইয়া যে সেটি প্রজারা দুর্ভিক্ষের গ্রাসে কবলিত হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? একেত ভারতবর্ষের প্রজারাই তাহা দিবে, তাহার পর আবার তাহার পৌনে ষোলআনা অংশটা স্বদেশেই গিয়া পড়িবে। যে রাজত্বে রাজার এই রাজনীতি, সে রাজত্বে দুর্ভিক্ষ হইবে না ত কি হইবে?

ইংরাজ শাসনের যে বিভাগই আলোচনা কর, এইরূপ ভয়ানক অবৈধ আচরণ দেখিতে পাইবে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ—খুব সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, স্বদেশীয় বিদ্বান্ মূর্খ, সৎ অসৎ, অক্ষম, সক্ষম যত লোকই আসুক আসুক, আসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে হাজার হাজার টাকা বেতন ভোগ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা পুঁজি করিয়া আবার দেশে প্রত্যাগমন করুক, ইহাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি। দেশের লোকগুলা মুটে মজুরি করুক, না হয় কেরাণীগিরি করুক, বড় না হয় দুই চারটা হাকিমী করুক। টাকা অনেক খরচ হইবে—হইনই

তাহার পর, দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করা রাজার একটি প্রধান কর্তব্য। দেখ, এই কার্য্যই বা ইংরাজ কিরূপে করিতেছেন। যেরূপে করিতেছেন, তাহা অতি চমৎকার—অর্থাৎ আমাদের মুণ্ডটা আচ্ছা চর্ব্বণ করিতেছেন। ইংরাজেরা বাণিজ্যপ্রিয় জাতি; বাণিজ্যই তাঁহাদের লক্ষ্মী, বাণিজ্যই তাঁহাদিগকে তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নিত করিয়াছে। তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীর উপর সর্ব্বদা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দৃষ্টি করিতে থাকেন, দেখেন কোথায় কোন দেশে ছিদ্র আছে তথায় প্রবেশ করি, করিয়া আপনার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির কাটতির যোগাড় করি। এই ছিদ্র অন্বেষণ করিতে করিতেই তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ভগবান তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি শুচিকাভাবে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে ফাল হইয়া বহির্গত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতবর্ষ সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, তাহাতে আবার তাঁহার নিজের অধীনে, সুতরাং এখানে তাহার বাণিজ্য লালসা পরিপূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যেরূপ তীব্রতা এবং নির্ম্মমতার সহিত তিনি আপনার লালসা পরিতৃপ্ত করিতেছেন তাহাতে আমরা—ভারতবাসীরা প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছি। ইংরাজ স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী, অর্থাৎ দেশের মধ্যে কেহই কোন বিষয়ের বাণিজ্য করুক, তাঁহার

কোনরূপ প্রীতিবন্ধকতা করিতে তিনি রাজী নহেন। অনেক দেশের—এমন কি ইউরোপীয় সকল সভ্যতম রাজ্যেরই এরূপ প্রথা আছে যে যদি কেহ তথায় বিদেশজাত কোন দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার উপর শুল্ক আদায় হইয়া থাকে। স্বদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির স্বল্প মূল্যতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই এই শুল্ক আদায় হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে এই শুল্ক কর্তৃক রাজস্ব স্বরূপ অনেক টাকা ও উঠিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজ ভারতবর্ষে এই শুল্ক আদায় করেন না, পূর্ব্বে অল্প স্বল্প কিছু কিছু ছিল, এখন আবার তাহা একেবারেই উঠাইয়া দিয়াছেন। সোজা কথায় বুঝিতে গেলে ইংরাজের এই কার্য্যটি অতি প্রশংসনীয় বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে যে ইহাতে ভয়ানক অভিপ্রায় নিহিত আছে। ইংলণ্ডের শিল্পজাত যত দ্রব্যাদি আমদানি হয় তাহাই ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশীক বাণিজ্য সামগ্রী, যদি শুল্ক লইতে হয়, তাহা হইলে স্বদেশীয় জিনিষের উপরই তাহা বসাইতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের তাহা অভিপ্রায় নহে, কেননা তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশীয় বাণিজ্যের অসুবিধা হইবে, এই ভারতবর্ষ যে জন্য জয় করিয়াছেন তাহার আসল উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইবে! অতএব ইংরাজ আইন পাশ করিয়া দিলেন যে ইংলণ্ডীয় যত দ্রব্যাদি আসিবে তাহাতে কিছুমাত্র শুল্ক লাগিবে না। আহো স্বাধীন বাণিজ্য! অহো ইংরাজের উদার নীতি!

আমরা স্বাধীন বাণিজ্যের বিরোধী নহি এবং বুঝি যে অবস্থা বিশেষে ইহা দেশের হিতকারী। কিন্তু সে অবস্থা বিশেষে—সদা সর্ব্বদা নহে। ইংলণ্ড খুব সভ্য দেশ স্বীকার করি, কিন্তু আমেরিকা, জর্ম্মনি, ফ্রান্স কি সভ্য নহে? কিন্তু এ সমস্ত দেশেই স্বাধীন বাণিজ্যের সম্যক প্রচার নাই। তথায় বিদেশীয় যে কোন দ্রব্যের আমদানি হউক তাহার উপর শুল্ক আদায় হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে তথাকার রাজারা বিদেশীয় আমদানির উপর শুল্ক বসাইয়া স্বদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির স্বল্পমূল্যতা রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন। তবে আমেরিকা কিম্বা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যদি এই আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে—দরিদ্র ভারতবর্ষে যে সে আবশ্যকতা নাই ইহা কে বলিতে পারে? অবশ্য দেশের অবস্থা বিশেষে এই আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, সে কথা আমরা উপরে বলিয়াছি, সে বিশেষ অবস্থা এই যে যখন দেশের শিল্পবাণিজ্যের এতদূর বহুলতা এবং উৎকর্ষতা হইয়াছে যে তাহা আপনার জোরে এবং উৎকৃষ্টতায় পৃথিবীর সমস্ত দেশে আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে। সমগ্র পৃথিবী মধ্যে আজকাল কেবলমাত্র ইংলণ্ডের এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কেন না তথাকার উৎপন্ন শিল্প এত উৎকৃষ্ট, প্রচুর, এবং অজস্র যে তাহা দেশ বিদেশে বিনা সাহায্যে আপনা আপনিই প্রবেশ লাভ করিতে পারে। এমন অবস্থায় রাজা যদি স্বাধীন বাণিজ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন তাহা হইলে দেশের কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং বর্দ্ধিত পরিমাণে দ্রব্যাদির কাটতির জন্য জাতীয় ধনের বৃদ্ধিরই সম্ভা-

বনা। কিন্তু ভারতবর্ষের কি এই অবস্থা? ইংরাজ ভারতের রাজা, সেই ইংরাজের অবস্থা ভাল বলিয়া ভারতেরও অবস্থা ভাল যদি এরূপ বল তাহা হইলে নাচার, তদ্ভিন্ন ত ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন দুর্দ্দশা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। অতএব এই ভারতবর্ষে কি স্বাধীন বাণিজ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করা উচিত? কখনই নহে। কিন্তু ইংরাজ এমনই আমাদের রাজা, এমনই আমাদিগের উপর তাঁহার সন্তানবৎ বাৎসল্য, এমনই তাঁহার ভারতবাসীর উপর মমতা, যে তিনি অবাধে পূর্ণমাত্রায় ভারতবর্ষে স্বাধীন বাণিজ্য চালাইতেছেন। তাহার ফল এই হইতেছে, যে অক্ষম ভারতবাসীদিগের যত শিল্প বাণিজ্য উচ্ছিন্ন যাইতেছে, আর সবল সক্ষম উন্নত ইংরাজের শিল্পবাণিজ্য দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। দেশের অনেক লোক—এমন কি লক্ষ লক্ষ লোক এই আবশ্যকীয় শিল্পাদি করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের আর সে উপায় নাই, তাহারা একেবারে জীবনোপায় বিহীন হইয়া পড়িয়াছে! ইহাতেও দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে না ত কিসে হইবে?

এইরূপ যত দেখিবে এবং যেদিকেই দেখিবে দেখিতে পাইবে যে ভারতবর্ষে ইংরাজ যে রাজত্ব করেন সে স্বদেশীয় পিতৃতুল্য রাজার মত নহে, মমতা এবং সহানুভূতিশূন্য বিদেশীয়ের মত। দেশের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যেন পর পর—তাহাতে আত্মীয়তার, সমসুখদুঃখভোগীতার কিছুমাত্র নাম গন্ধও নাই। বৈদেশীক রাজত্ব বলিয়া এরূপ অবস্থা কতকটা অপরিহার্য্য; কিন্তু তাহার উপর আবার ইংরাজের ইচ্ছাও আমাদের সকল প্রকার স্বার্থের বিরোধী। তিনি ইচ্ছা করিয়াই আমাদের অনাত্মীয় হইয়া থাকেন—এরূপ বিসদৃশ সম্বন্ধ দূরীভূত করিয়া প্রজাবৎসলতা ভাবের অবতারণা করিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানদিগের সময় তিনি ব্যবসায় করিতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, লাভ করিব ইহাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, ভাগ্যক্রমে ঈশ্বরের অনুগ্রহে, অথবা না হয় স্বীকার করিলাম যে তাঁহার বাহুবলেই এদেশ জয় করিলেন, করিয়া ক্রমশঃ ইহার একছত্রী রাজা হইয়া বসিলেন। সামান্য বণিক সম্প্রদায় হইতে একটি মহাদেশ সদৃশ সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের রাজাধিরাজ হইয়া গেলেন; পূর্ব্বে কোন জিনিষে কত লাভ হইবে, কোন উপায় অবলম্বন করিলে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এই সমস্ত কথাই তাঁহার চিন্তনীয় ছিল, এক্ষণে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এক্ষণে কোটী কোটী নরনারী প্রজাস্বরূপে তাঁহার অধীনস্থ হইল, তাহাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের উন্নতি অবনতি, তাহাদের সম্পদ বিপদ, সমস্তই তাঁহার হস্তে নিপতিত হইল; সুতরাং এখন—এত পরিবর্ত্তনের—অবস্থার এত বিপর্য্যয়ের পর, তাঁহার মতি গতি, চেষ্টা চিন্তা, ইচ্ছা প্রবৃত্তি এসমস্তও পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে রাজরাজেশ্বর হইয়াও তাঁহার বণিক স্বভাবোচিত সঙ্কীর্ণ মনোভাব দূরীভূত হইল না। তাঁহার হৃদয়ে একটু 'রহম' হইল না, চক্ষুতে একটু 'পরদা' হইল না, আচরণে মহত্ব হইল না, ব্যবহারে প্রশস্ততা হইল না! লাভ লাভ লাভ, টাকা টাকা টাকা—যে বীজমন্ত্র লইয়া তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন,

এখন পর্য্যন্ত সেই বীজমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। হা অদৃষ্ট! হা ভারতবাসীর পোড়া কপাল! যে রাজা হইল, সে প্রজাপালন করিল না, যে রক্ষক হইল, সেই ই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইল, তোমরা আর দুর্ভিক্ষে মরিবে না ত মরিবে কে?

বাস্তবিক যে কথা আমরা বলিতেছি তাহার এক কপর্দ্দকও মিথ্যা নহে। রাজার প্রকৃত যে ধর্ম্ম—অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন এবং প্রজারঞ্জন—তাহা ইংরাজের নাই। প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব ছিল, ব্যবসাদারী রাজত্ব, রাজত্বের কাণ্ড কারখানা যাহা কিছু সে সমস্তেরই প্রধান লক্ষ্য এই যে ব্যবসায়ের যাহাতে উন্নতি হয়—জাতীয় বাণিজ্যের যাহাতে সম্প্রসারণ হয়। এই অভিপ্রায়েই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব করিতেন, কিন্তু যদিও তাঁহারা এক হিসাবে আমাদের রাজা ছিলেন তাঁহারা আবার সর্ব্ববিষয়ে ইংলণ্ডের রাজার অধীন ছিলেন—তাহাদের কার্য্যকলাপের যাহা কিছু জবাবদিহি তাহা তাঁহাদিগকে উক্ত রাজাকে বুঝাইয়া দিতে হইত। এজন্য উহারই মধ্যে তাঁহারা এক একটু ভয় করিয়া চলিতেন। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর স্বয়ং মহারাণী রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজ্য গ্রহণের সময় ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে এখন হইতে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। লোকের মনে ভরসা হইল—ভাবিল এইবার বুঝি রাজা রাজোচিত কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। কিন্তু বাহিরে সাফাই করিলে [illegible] কি, ভিতরে যে মালিন্যে পরিপূর্ণ! [illegible] ৪৫ বৎসর এই প্রায় রাজত্ব গ্রহণ করা [illegible]; ইহার মধ্যে কত পরামর্শ, বিচার, বিবেচনা, আন্দোলন, আলোচনা হইল; কিন্তু কেহ বলিতে পারে, এমন কি ইংরাজ স্বয়ং বলিতে পারেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক কপর্দ্দকও তিনি প্রজাপালন কার্য্যে হৃদয়ের প্রশস্ততা লাভ করিয়াছেন? পূর্ব্বের মত ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা এখনও বাড়িতেছে, স্বদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি করিবার ঝোঁক এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে এবং ভারতবাসীর ক্ষতি করিয়া স্বত পরতঃ স্বজাতি প্রতিপালনের ইচ্ছা এখনও পূর্ব্ববৎ বলবতী রহিয়াছে। আর প্রজাবর্গের উপর দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা—সে কথা আর বলিয়া কায কি? ৭।৮টা দেশী সিভিলিয়ান হইল, অমনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমাইয়া দেওয়া হইল! সে কয়টা সিভিলিয়ান মরেও না, দেখিতে দেখিতে গোকুলে বৰ্দ্ধিত হইয়া পড়িল; তাহারা ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের সমকক্ষ হইয়া সমান মর্য্যাদার প্রার্থী হইল। চাহিল যে যেমন ইংরাজ কর্ম্মচারীরা শ্বেত কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে বিচার করিয়া থাকে, আমাদিগকেও সেইরূপ ক্ষমতা দেও। আঃ সর্ব্বনাশ! সমস্ত রাজপুরুষেরা, রাজপুরুষদিগের স্বজাতীয় সমস্ত আত্ম কুটুম্বেরা অমনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন; রাজত্বের অমঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিলেন, প্রতি পদক্ষেপে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন; তাঁহাদের লজ্জা, অপমান, ক্রোধ, অভিমান—এ সমস্তেরও সীমা পরিসীমা থাকিল না; পুরুষেরা দস্ত খামাটি করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা কোমল স্বভাব সুলভ কাঁদুনি সুরে আপনাদিগের সম্ভ্রম, সতীত্ব এবং মর্য্যাদা হানির ভয় দেখাইয়া ইংলণ্ডে মহারাণীর নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। আর

ইংরাজ সিংহ—আমাদের প্রজাবৎসল পিতৃতুল্য রাজা অমনি ভয় পাইয়া গেলেন। কোটী কোটী হস্তপদ হৃদয়মন বিশিষ্ট ভারতবর্ষীয় প্রজাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কয়েক সহস্র মাত্র স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় শ্বেতাঙ্গের কল্পিত দুঃখে বিগলিত হইয়া গেলেন! আহো রাজত্ব! অহো প্রজাপালনরত! অহো উদারতা! ভাই ভারতবাসি! তোমরা কোথায় আছ, কোথায় বাস করিতেছ, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখ না? মুসলমান রাজত্ব অসভ্য, অত্যাচারী, বিধর্ম্মী, বিজাতীয় ছিল, বলিয়া থাক যে সে রাজত্বে বড়ই তোমার কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ভাই একবার স্থিরচিত্তে তুলনা করিয়া দেখ, নিরপেক্ষ হইয়া তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া দেখ, ন্যায়ান্যের বোঝা কোনদিকে বেশী। অত্যাচারী অনুদার অসভ্য মুসলমান রাজত্বে সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী প্রধান সেনাপতি তুমি হইতে পাইয়াছ; কিন্তু সুসভ্য এবং উদার ইংরাজ রাজত্বে তুমি একজন সামান্য জেলার মাজিষ্ট্রেটও হইতে পাওনা, যদিও পাও, তাহা হইলে একজন শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ দোষ করিয়াছে, বিচারাসনে বসিয় তাহাকে দোষী বলিবারও তোমার অধিকার নাই। এই অবস্থায়—এই শোচনীয় অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্দ্দশায় তুমি উপস্থিত হইয়াছ, তোমার ঘরে যে অহরহ—বৎসরের ৩৬৫ দিনই কাল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

আমাদের দুর্ভিক্ষ প্রবনতা ব্যাধি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলিলাম। রাজার নির্ম্মমতা, অবৈধ আচরণ, কর্ত্তব্য খলিততাই তাহার প্রধান কারণ। তাহা হইলে বল দেখি, এমন অবস্থায় স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে তাহা নিবারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অল্প অল্প টাকা খরচ করিলে কি তাহার প্রকৃত উপায় হইবে? আমরা বলি কিছুতেই নহে। আজ যেন একটা কিম্বা দুইটা জেলায় অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই ১০ হাজার কিম্বা বিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া না হয় তথাকার লোকদিগের কষ্ট কথঞ্চিৎ দূরীকরণ করিলে; কিন্তু একেবারে সমগ্র দেশের যখন এই অবস্থা উপস্থিত হইবে তখন কি করিবে? আর শীঘ্রই—এক বৎসরে দুই বৎসরে না হউক, দশ বৎসর মধ্যেই যে দেশের সেইরূপ ভয়াবহ অবস্থা উপস্থিত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠকগণ! আপনারা সকলেই দেশের অবস্থাটা একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, মনের ভিতর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থাটা একবার আলোচনা করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের কথা ঠিক, কিম্বা অতি রঞ্জিত কল্পনামাত্র। আমাদের বাল্যকালে দেশে—গরিবের গৃহে যে প্রাচুর্য্য এবং স্বচ্ছলতা দেখিয়াছি, তাহা এই ২৫।৩০ বৎসর মধ্যেই পিতামহীর উপকথায় পরিণত হইয়াছে। আজ ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বেও যাহা কিছু অবশিষ্টাংশ দেখিয়াছি তাহাও এক্ষণে বিরল হইয়া পড়িয়াছে, ইহার পর কি হইবে তাহা ঈশ্বরই অবগত আছেন! এমন অবস্থায়, সুধু গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা ভিক্ষা করিতে পারিলেই যে আমরা দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের সমস্ত উপায় করিলাম, আমাদের আসল ব্যাধি—দুর্ভিক্ষ প্রবণতা—তাহার উপশমের চূড়ান্ত চেষ্টা করিলাম তাহা আমরা স্বীকার করি না। আমাদের বিবেচনায় সে চেষ্টা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা পরবারে বলিব।

ক্রমশঃ—

সাহিত্য সমালোচন।

সাময়িক পত্র।

মাঘ।

আমরা মাঘ মাসের নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

আলোচনা, প্রচার, ভারতী, নব্যভারত, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রবাহ, (মাঘ ফাল্গুন একত্রে) এবং রামধনু।

এই সমস্ত পত্রিকা গুলিতে মোট প্রবন্ধ সংখ্যা ৭৩, তন্মধ্যে—

রাজনীতি ...	১
হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্ম	১১
ইতিহাস	১১
সমাজনীতি	৭
জীবনচরিত	৪
নবন্যাস	৬
বিজ্ঞান, শিল্প এবং বাণিজ্য	৯
বিবিধ	৮
ব্রাহ্মধর্ম্ম	২
পদ্য	৮
প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৪
	৭৩

উপরোক্ত তালিকা সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র এবং ধর্ম্মেরই উপর আজকাল আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশী। ইহা অতি সুলক্ষণ বলিতে হইবে, কেননা ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস যে যদি ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার লুপ্ত সভ্যতা এবং সৌভাগ্য কখন পুনঃ প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার পুরাতন শাস্ত্রাদির প্রকৃত অর্থবোধ এবং প্রচারের দ্বারাই হইবে—অন্য উপায়ে হইবে না। ইংরাজী শিক্ষা এবং সভ্যতা কর্তৃক ঘূর্ণিত মস্তক সমাজ সংস্কারকেরা যাহাই বলুন, যাহাই করুন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বদেশীয় আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিস্বরূপ না করিয়া লইবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের সকল চেষ্টা, উদ্যম এবং উৎসাহই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের জাতীয় উন্নতি কার্য্যের মূলধনের কিছুমাত্র অভাব নাই; কালক্রমে সহস্র সহস্র প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা সে সমস্ত হারাইয়াছি বটে; কিন্তু তাহা একেবারে যায় নাই, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ এখনও আমাদের দেশের, সমাজের—আমাদের অন্তরের অন্তর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে। একটু ঘসা মাজা একটু চর্চ্চা আলোচনা করিলেই, দিনকতক নানাবিধ নয়ন মুগ্ধকর বৈদেশীক ব্যাপারের ধাক্কা হইতে আমাদের মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলেই, আবার তাহা